সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

একচত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত

কলিকাতা

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৪১

একচত্বারিংশ ভাগের

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[একচত্বারিংশ ভাগ]

মহাভারতে দশাঙ্ক সংখ্যা*

দশাঙ্ক-সংখ্যা-প্রণালী হিন্দুর অতুল কীর্ত্তি। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমস্ত সভ্য জাতি কর্ত্তৃক এখন তাহা পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কোন্ অতীত কালে কোন্ মহর্ষি উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানা নাই। এই বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু গণিতবিদ্‌গণ সম্পূর্ণ নীরব। পুরাণের মতে, উহার আবিষ্কর্ত্তা ব্রহ্মা।১ পরবর্ত্তী কালের কোন কোন গণিতবিদ্‌ও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।২

দশাঙ্ক-সংখ্যা ব্যবহারের যে সমস্ত প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কোনটাই তত পুরাতন নহে।৩ 'অনুযোগদ্বার-সূত্র' নামক জৈন আগমগ্রন্থে একটা উনত্রিংশস্থানী সংখ্যার উল্লেখ আছে। সেই গ্রন্থ শকপূর্ব্ব প্রথম, কি দ্বিতীয় শতকে রচিত। পিঙ্গলাচার্য্যকৃত 'ছন্দঃসূত্রে' শূন্য, এক ও দুই অঙ্কের প্রয়োগ আছে। সুতরাং তাহার রচনাকালে দশাঙ্ক সংখ্যা নিঃসন্দেহ ছিল। দুঃখের বিষয় যে, পিঙ্গলাচার্য্যের কাল এখনও সঠিক নিরূপিত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতজ্ঞগণের মতে, তিনি শককালারম্ভের তিন

---

* ১৩৪০।২৩এ পৌষ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। যথা বায়ুপুরাণে (১০১।২০৮) আছে—

"এষা সংখ্যাকৃতা সংখ্যা ঈশ্বরেণ স্বয়ম্ভুবা।
গণনা বিনিবৃত্তৈষা সংখ্যা ব্রাহ্মী চ মানুষী॥"

২। সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়, জন্ম ১০৩৬ শক) এবং তাঁহার টীকাকার কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ (১৫০০ শক প্রায়) এই কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। আরব ঐতিহাসিক অল্-মাসুদি হিন্দুস্থানে আসিয়া (৮৩৪ শকে) তাহা শুনিয়াছিলেন। (লেখকের "Testimony of Early Arab Writers on the Origin of Our Numerals" নামক প্রবন্ধ দেখ। *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. 24 (1932), pp 193-218 ; বিশেষভাবে ১৯৫ পৃষ্ঠা)।

৩। এই সম্বন্ধে সবিস্তর জানিতে হইলে পরোক্ত প্রবন্ধ ও পুস্তক দ্রষ্টব্য—শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত-লিখিত, "Early History of the Principle of Place Value" (*Scientia*, 1931) 1 "Early Literary Evidence of the Use of the Zero in India" (*American Mathematical Monthly*, vol. 33 (1926), pp 449—454 ; vol. 38 (1931), pp 566 572) ; "A Note on the Hindu Arabic Numerals' (*Ibid*, vol. 33 (1926), pp 220-1). D. E. Smith and L. C. Karpinski, *Hindu Arabic Numerals*, Boston, 1911.

শত বৎসরেরও পূর্ব্বেকার লোক। হিন্দু পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, তিনি আরও প্রাচীন।১ দশাঙ্ক-সংখ্যার অপরাপর প্রমাণ শককালীয়। তাহাদের অধিকাংশই আবার চারি শত শকেরও পরবর্ত্তী সময়ের। তাহার পূর্ব্বেকার প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত বস্তুত খুব কমই পাওয়া গিয়াছে।২

সম্প্রতি আমরা একটা নূতন প্রমাণ পাইয়াছি। তাহা হইতে প্রতীয়মান হয়, মহাভারত-কালেরও পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে দশাঙ্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল। মহাভারতে একটা সুপ্রাচীন আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি অষ্টাবক্র কোন সময়ে—তখন তিনি দ্বাদশবর্ষীয় ব্রহ্মচারী বালক মাত্র—বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বন্দীর সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। ঐ বন্দী মহাবিদ্বান্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা সংখ্যাত্মক বস্তু উল্লেখে বাদানুবাদ আরম্ভ করেন।

বন্দী উবাচ,

এক এবাগ্নির্ব্বহুধা সমিধ্যতে
একঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বমিদং বিভাতি।
একো বীরো দেবরাজোঽরিহন্তা
যমঃ পিতৄণামীশ্বরশ্চৈক এব ॥ ৮ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

দ্বাবিন্দ্রাগ্নী চরতো বৈ সখায়ৌ
দ্বৌ দেবর্ষী নারদপর্ব্বতৌ চ।
দ্বাবশ্বিনৌ দ্বে রথস্যাপি চক্রে
ভার্য্যাপতী দ্বৌ বিহিতৌ বিধাত্রা ॥ ৯ ॥

বন্দী উবাচ,

ত্রিঃ সূয়তে কর্ম্মণা বৈ প্রজেযং
ত্রয়ো যুক্তা বাজপেয়ং বহন্তি।
অধ্বর্য্যবস্ত্রিসবনানি তন্বতে
ত্রয়ো লোকাস্ত্রীণি জ্যোতীংষি চাহুঃ ॥ ১০ ॥

১। মহাভারতে (নীলকণ্ঠকৃত টীকা সহ, পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২৬ শকাব্দ, আদিপর্ব্ব, ৫৩।৬,৭) দেখা যায়, মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৃত ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে পিঙ্গল নামে দুই জন ঋষি ছিলেন। একজন অধ্বর্য্যু, অপরে সদস্য ছিলেন। ঐ সত্রে সশিষ্য ভগবান্ বেদব্যাস এবং আরও অনেক মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন। মগধাধিপতি বিন্দুসারের প্রধান সভা-পণ্ডিতের নামও পিঙ্গলাচার্য্য ছিল। ইহাঁদিগের কে 'ছন্দঃসূত্রে'র রচয়িতা, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

২। মধ্যভারতে নাগপুরের সন্নিকটে বিক্রমখোল গুহায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যার প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। ঐ লিপি নাকি শকাব্দ-প্রবর্ত্তক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা সাতবাহন বা শালিবাহন উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। উহার উৎকীর্ণ কাল 'রসসির' অর্থাৎ ১৬ অব্দ। রস=৬, সির=সূর্য্য=১। যাহা হউক, শিলালিপিজ্ঞগণ এখনও এই বিষয়ে সন্দেহমুক্ত নহেন। (শ্রীহরিদাস পালিত, "বিক্রমখোল-লিপি" প্রবাসী, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ সংখ্যা, ৫৪০—৩ পৃষ্ঠা)।

অষ্টাবক্র উবাচ,

চতুষ্টয়ং ব্রাহ্মণানাং নিকেতং
চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিমং বহন্তি।
দিশশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়ঞ্চ
চতুষ্পদা গৌরপি শশ্বদুক্তা ॥ ১১ ॥

বন্দী উবাচ,

পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চপদা চ পঙ্‌ক্তি-
র্যজ্ঞাঃ পঞ্চৈবাপ্যথ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি।
দৃষ্টা বেদে পঞ্চচূড়াপ্সরাশ্চ
লোকে খ্যাতং পঞ্চনদঞ্চ পুণ্যম্ ॥ ১২ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

ষড়াধানে দক্ষিণামাহুরেকে
ষট্ চৈবেমে ঋতবঃ কালচক্রম্।
ষড়িন্দ্রিয়াণ্যুত ষট্ কৃত্তিকাশ্চ
ষট্ সাদ্যস্কাঃ সর্ব্ববেদেষু দৃষ্টাঃ ॥ ১৩ ॥

বন্দী উবাচ,

সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্ত বন্যাঃ
সপ্ত চ্ছন্দাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি।
সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি
সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা ॥ ১৪ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

অষ্টৌ শাণাঃ শতমানং বহন্তি
তথাষ্টপাদঃ সরভঃ সিংহঘাতী।
অষ্টৌ বসূন্ শুশ্রুম দেবতাসু
যূপশ্চাষ্টাশ্রির্বিহিতা সর্ব্বযজ্ঞে ॥ ১৫ ॥

বন্দী উবাচ,

নবৈবোক্তাঃ সামিধেন্যঃ পিতৄণাং
তথা প্রাহুর্নবযোগং বিসর্গম্।
নবাক্ষরা বৃহতী সম্প্রদিষ্টা
নবৈব যোগো গণনেতি শশ্বৎ ॥১৬॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

দিশো দশোক্তাঃ পুরুষস্য লোকে
সহস্রমাহুর্দশপূর্ণং শতানি।
দশৈব-মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যো
দশেরকা দশ দাশা দশার্হাঃ ॥ ১৭ ॥

বন্দী উবাচ,

একাদশৈকাদশিনঃ পশূনা-
মেকাদশৈবাত্র ভবন্তি যূপাঃ।
একাদশ প্রাণভৃতাং বিকারা
একাদশোক্তা দিবি দেবেষু রুদ্রাঃ ॥ ১৮ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

সংবৎসরং দ্বাদশমাসমাহুঃ
জগত্যাঃ পাদো দ্বাদশৈবাক্ষরাণি।
দ্বাদশাহঃ প্রাকৃতযজ্ঞ উক্তো
দ্বাদশাদিত্যান্ কথয়ন্তীহ ধীরাঃ ॥ ১৯ ॥

বন্দী উবাচ,

ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা
ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ।
* * * * ॥ ২০ ॥

অষ্টাবক্র উবাচ,

ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী
ত্রয়োদশাদীন্যতিচ্ছন্দাংসি চাহুঃ।
* * * * ॥ ২১ ॥" ১

একই অগ্নি বহু প্রকারে প্রজ্বলিত হয়; এক সূর্য্য এই সমগ্র জগৎ আলোকিত করে; অরিহন্তা বীর দেবরাজ এক; পিতৃগণের ঈশ্বর যম একই। (৮)

সহচারী ইন্দ্রাগ্নি দুই; দেবর্ষি দুই—নারদ এবং পর্ব্বত; অশ্বিনীকুমার দুই; রথচক্র দুই এবং বিধির বিধানে ভার্য্যাপতি দুই। (৯)

কর্ম্মনিমিত্ত প্রজাজন্ম তিন; ত্রয়ী অনুসারে বাজপেয় সম্পন্ন হয়। অধ্বর্য্যুগণের বিধানানুযায়ী সবন তিন; লোক তিন এবং জ্যোতিও তিন বলিয়া কথিত হয়। (১০)

ব্রাহ্মণের আশ্রম চার; এই যজ্ঞের অধিকারী বর্ণ চার; দিক্ চার, গো চতুষ্পাৎ, তাহা সদা কথিত হয়। (১১)

অগ্নি পাঁচ; পঙ্‌ক্তি পাঁচ পদযুক্ত; যজ্ঞ নিশ্চয় পাঁচ; ইন্দ্রিয়ও পাঁচ; বেদে দেখা যায়, চূড়া পাঁচ এবং অপ্সরা পাঁচ'। পুণ্য পঞ্চ নদ লোকে খ্যাত আছে। (১২)

কেহ কেহ বলেন, আধানে দক্ষিণা ছয়; কালচক্রে ঋতু ছয়; ইন্দ্রিয় ছয়; কৃত্তিকা ছয়; সমস্ত বেদে দেখা যায়, সাদ্যস্কা ছয়। (১৩)

গ্রাম্য পশু সাত; বন্য পশু সাত; সপ্ত ছন্দ এক যজ্ঞ সম্পন্ন করে; ঋষি সাত; অর্হণা সাত; বীণাতন্ত্রী সাত, তাহা খ্যাত আছে। (১৪)

১। মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১০৪ অধ্যায়, কলিকাতা সংস্করণ; ১৩৬ অধ্যায়, দাক্ষিণাত্য পাঠ, কুম্ভকোণ সংস্করণ।

অষ্ট শাণ শতমান ধারণ করে ; সিংহঘাতী সরভ অষ্টপাৎ ; প্রসিদ্ধ আছে—দেবতাদের বসু আট ; সর্ব্ব যজ্ঞে বিহিত যুপ অষ্টাস্রি। (১৫)

কথিত আছে, পিতৃগণের সামিধেনী নব।১ বিসর্গ নবসংযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হয়। বৃহতী ছন্দঃ নবাক্ষরা বলিয়া সমুদ্দিষ্ট। গণনাযোগ (বা অঙ্ক) সর্ব্বত্রই নব মাত্র। (১৬)

দিক্ দশও উক্ত হয়। লোকে পুরুষের মায়া দশ ; তাহা শত ও সহস্র বলিয়াও কথিত হয়। গর্ভবতী মাত্র দশ মাস গর্ভ ধারণ করে। এরক দশ ; দাশ দশ ; এবং অর্হ দশ। (১৭)

জীবের ইন্দ্রিয়বিষয় একাদশ ; পশু-যূপ একাদশই ; ইন্দ্রিয়বিকার একাদশ ; স্বর্গে রুদ্র একাদশ, প্রসিদ্ধ আছে। (১৮)

সংবৎসরে মাস দ্বাদশ ; জগতীর পাদে দ্বাদশ অক্ষর ; প্রাকৃতযজ্ঞ দ্বাদশ দিনে সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞ লোকেরা কহেন, আদিত্য দ্বাদশ। (১৯)

প্রশস্ত তিথি ত্রয়োদশ ; পৃথিবীতে দ্বীপ ত্রয়োদশ ;...। (২০)

কেশী ত্রয়োদশাহ গমন করেন ; অতিচ্ছন্দ (অতিজগতী) ত্রয়োদশ ; ..। (২১)

অষ্টাবক্র ও বন্দীর এই আলোচনার গূঢ়ার্থ দুর্ব্বোধ্য। সমস্তটা একটা 'অঙ্কসংজ্ঞা-নিঘণ্টু' বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা সকলকে তাহার একটা বাক্য বিশেষভাবে অবধান করিতে বলি। "নবৈব যোগো গণনেতি শশ্বৎ"২—অর্থাৎ গণনাযোগ (বা অঙ্ক) সদাই নব মাত্র। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি (১৫০০ শককাল প্রায়) এই প্রকারে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "নবৈবাঙ্কাঃ ক্রমভেদেন স্থিত্বা যথেষ্টং সংখ্যাবাচিনো ভবন্তি।" তিনি উহার একটা প্রাচীন টীকাও অনুবাদ করিয়াছেন, "গত্বাঽনন্তং নবাঙ্কী গণিতমিব...।"

হিন্দুগণিতশাস্ত্রে 'অঙ্ক' সংজ্ঞা ৯ খ্যাপন করে। হিন্দুরা শূন্য চিহ্নকে ঐ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেন না। সেই হেতু তাঁহারা নবাঙ্কের কথা বলেন।৩ কিন্তু হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সংখ্যাপ্রণালীতে শূন্য চিহ্নকে লইয়া সর্ব্বসমেত দশটা অঙ্ক আছে। সেই নিমিত্ত মধ্য যুগের পাশ্চাত্ত্য গণিতবিদ্গণ উহাকে দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী বলিতেন। ঐ নামেই উহা এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত। এই সম্বন্ধে আমরাও সুপ্রাচীন হিন্দু নামের পরবর্ত্তে সেই বহুপরিচিত নামকে, কালধর্ম্মে সমীচীন মনে করিয়া, গ্রহণ করিয়াছি।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মহাভারতের বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয়, অষ্টাবক্রোপাখ্যান অতি প্রাচীন। বনবাসকালে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পাণ্ডবগণ ঋষি ও ব্রাহ্মণমণ্ডলী সহ মহর্ষি শ্বেতকেতুর পুরাতন আশ্রমে উপস্থিত হন। তাহা তখন মহাপুণ্যতীর্থ বলিয়া

১। যে ঋক্ পাঠ করিয়া হোতা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালন করেন, তাহার নাম 'সামিধেনী'। 'শতপথব্রাহ্মণে' (১৩৷৫) এই 'সামিধেনী' শব্দের নির্ব্বচন আছে। 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' (৩৷৫) আছে, সামিধেনী একাদশটি।

২। দাক্ষিণাত্য পাঠানুসারে, 'নবৈব যোগো গণনায়েতি শশ্বৎ'।

৩। এই বিষয়ে লেখকের "অঙ্ক-সংখ্যা-প্রণালী" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ৮—৩০ পৃষ্ঠা ; বিশেষভাবে ২৮-৯ পৃষ্ঠা)।

পরিগণিত হইত। বস্তুত মহর্ষি শ্বেতকেতু এবং তাঁহার পিতা মহর্ষি উদ্দালকের নাম আজ পর্য্যন্ত চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে যে অমৃতোপদেশ দিয়াছিলেন, যাহার পরমবাণী "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো," 'হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই পরব্রহ্মই,' তাহা আজ পর্য্যন্ত জগৎকে মুগ্ধ করে। সেই মহাবাণীর উৎপত্তিক্ষেত্র, মহর্ষি শ্বেতকেতুর মহাপবিত্র আশ্রমের অতীত মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋষি লোমশ যুধিষ্ঠিরকে প্রাচীন অষ্টাবক্রোপাখ্যান শুনাইয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষি অষ্টাবক্র ঐ আশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।১

এই প্রকারে স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে দেখা যায়, মহাভারতকালের পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে দশাঙ্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল। 'মহাভারত' মূলে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কর্তৃক রচিত হয়। তখন তাহার নাম ছিল 'ভারত'। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়া উহা ক্রমে বিরাট্ কলেবর ধারণ করে। তখন হইতে উহা 'মহাভারত' নামে বিখ্যাত হয়। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বালগঙ্গাধর তিলকপ্রমুখ মনীষিগণ প্রমাণ করিয়াছেন, শকপূর্ব্ব ৫০০ অব্দে মহাভারত বর্ত্তমান আকারে ছিল।২

অষ্টাবক্রোপাখ্যানাত্মক মহাভারতাংশ যে প্রাচীন, তাহা স্বতন্ত্ররূপেও প্রমাণ করা যায়। তত্রস্থ অঙ্কসংজ্ঞা পরবর্ত্তী কালে ব্যবহৃত সংজ্ঞা হইতে বহুলাংশে ভিন্ন। তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র প্রদর্শন করিয়াছি।৩ যথা, ১ সংখ্যা বিবক্ষার্থ উক্ত উপাখ্যানস্থ অঙ্কনিঘণ্টুতে অগ্নি, সূর্য্য, দেবরাজ ও যম সংজ্ঞার উল্লেখ আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালের সংজ্ঞা, অগ্নি = ৩, সূর্য্য = ১২, দেবরাজ (= ইন্দ্র) = ১৪ এবং যম = ২। আদিত্য = ১২ সংজ্ঞা তথায় ও পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে আছে। অগ্নি = ৫,ব্যবহার অপর কুত্রাপি পাই নাই। উহার উপপত্তি শ্রুত্যুক্ত কঠোপনিষদের পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় পাওয়া যায়। পিঙ্গলছন্দঃসূত্রেও বেদ = ৪। কিন্তু ঐ উপাখ্যানে বেদ ত্রয়ী, চার নহে। উহাতে এমন আরো কতকগুলি সংজ্ঞা আছে, যেগুলি পরবর্ত্তী কালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। যথা, সাম্বৎসরা = ৬, গ্রাম্য পশু = বন্য পশু = ৭, যূপ = ৮, ১১, চূড়া = অপ্সরা = ৫, সামিধেনী = ৯, শাণ = ৮, বিসর্গ = ৯, ইত্যাদি। ইহাদের কতকগুলির উপপত্তি বৈদিক, সেইখানেই উক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে মনে হয়, অষ্টাবক্রোপাখ্যানোক্ত অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু হিন্দুস্থানের অবৈদিক—জৈন এবং বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বকালের। উহা বৈদিক প্রভাবান্বিত যুগেই রচিত হইয়াছিল।

১। অষ্টাবক্র মহর্ষি উদ্দালকের প্রিয় শিষ্য এবং জামাতা ঋষি কহোড়ের পুত্র। সুতরাং শ্বেতকেতুর ভাগিনেয়। উভয়ে প্রায় সমবয়সী ছিলেন। তাঁহারা মহর্ষি উদ্দালকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাঁহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বিজয়ার্থে তাঁহারা একদা বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞসভায় উপস্থিত হন। সেইখানে জনকের বন্দীর সহিত অষ্টাবক্রের প্রতিযোগিতা হয়।

২। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', পুনা, পৃষ্ঠা ৮৭-৯০, ১১১ ও ১৩৭ ; বালগঙ্গাধর তিলক, 'গীতারহস্য', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত বাঙ্গালা ভাষান্তর, কলিকাতা, ১৯৮১ সম্বৎ, ৫৬৭-৫৭১ পৃষ্ঠা।

৩। 'শব্দসংখ্যাপ্রণালী', ২১ পৃষ্ঠা।

আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অষ্টাবক্রোপাখ্যানে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মচারী অষ্টাবক্র যখন যজ্ঞসভায় উপস্থিত হন, তথাকার দ্বারপাল তাঁহাকে বালক দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। তিনি জনক রাজাকে আপনার বিদ্যাবত্তায় তুষ্ট করিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। রাজা বলিলেন,

"ত্রিংশকদ্বাদশাংশস্য চতুর্বিংশতিপর্ব্বণঃ।
যস্ত্রিষষ্টিশতারস্য বেদার্থং স পরঃ কবিঃ॥" ১

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন,

"চতুর্ব্বিংশতিপর্ব্ব ত্বাং ষন্নাভি দ্বাদশপ্রধি।
তত্ত্রিষষ্টিশতারং বৈ চক্রং পাতু সদাগতি॥" ২

অত্রস্থ 'ত্রিষষ্টিশত'=৩৬০, ব্যবহার অদ্ভুত। বৈদিক সাহিত্য এবং পাণিনির ব্যাকরণ মতে ত্রিষষ্টিশত=১৬৩; এবং আধুনিক মতে উক্ত সংখ্যা ৬৩০০। ঐ শ্লোকদ্বয়নিহিত বস্তুর ভাবও সম্পূর্ণ বৈদিক।৩ এই সমস্ত বিষয় অষ্টাবক্রোপাখ্যানের প্রাচীনত্বের সূচক।

দশাঙ্ক সংখ্যার অপর প্রমাণও মহাভারতে পাওয়া যায়। তবে তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের মত নিঃসন্দিগ্ধ নহে। তথাপি সুধীবর্গের বিচারার্থ আমরা এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিব।

দেবর্ষি নারদের উপদেশে পাণ্ডবেরা নিয়ম করিলেন যে, তাঁহাদের একজন যখন দ্রৌপদীর গৃহে থাকিবেন, তখন অন্য কোন জন তথায় যাইতে পারিবেন না। যিনি এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া বার বৎসর বনে বাস করিতে হইবে।৪ অর্জ্জুন ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া একবার এই নিয়ম ভঙ্গ করেন। সেই কারণে তাঁহাকে বার বৎসর বনবাস করিতে হয়। ঐ কালের শেষভাগে তিনি দ্বারকায় গমন করেন। তথায় তিনি সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। এখন প্রশ্ন, বনবাসকালের কতটা অতীত হইলে অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করেন? মহাভারত বলে৫—

"সংবৎসরং পূর্ণং মাসমেকং"

১। বনপর্ব্ব, ১৩৩।২৪ (কলিকাতা সং)=১৩৫।২৬ (কুম্ভকোণ সং)। শেষোক্ত সংস্করণের পাঠ—"ষন্নাভের্দ্বাদশাক্ষস্য" ইত্যাদি।

২। ঐ, ১৩৩।২৫ (কলিকাতা সং)=১৩৫।২৭ (কুম্ভকোণ সং)।

৩। ব্রহ্মচক্রের এই প্রকার বর্ণনা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১।৪) দেখা যায়।

৪। মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২১২।২৯

৫। "স বৈ সংবৎসরং পূর্ণং মাসমেকং বনে বসন্।
ততোঽগচ্ছদ্ধৃষীকেশং দ্বারাবত্যাং কদাচন।
লব্ধবাংস্তত্র বীভৎসুর্ভার্য্যাং রাজীবলোচনাম্॥"

আদিপর্ব্ব, ৬১।৪২-৩

নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

"দশসংখ্যাপূরকত্বাৎ পূর্ণশব্দেন দশগুণমুচ্যতে, সংবৎসরং পূর্ণম্ একঞ্চ, তথা মাসং পূর্ণমেব। তেন একাদশ সংবৎসরাঃ দশ মাসাশ্চ ভবন্তি। তেষাঞ্চ সৌরাণাং প্রত্যব্দং সপাদপঞ্চদিনবৃদ্ধ্যা সাবনা দ্বাদশাব্দা ভবন্তি। অন্যে তু মাসশব্দেন দ্বাদশসংখ্যাং লক্ষয়ন্ত একশব্দবৈয়র্থ্যমেকবচনানুপপত্তিঞ্চ নেক্ষন্তে।"

দশসংখ্যার পূরক বলিয়া দশকে পূর্ণ বলে। পূর্ণ এবং এক সংবৎসর, আর পূর্ণ মাস। তাহাতে এগার বৎসর দশ মাস হয়। এইগুলি সৌর অব্দ। বৎসরে ৫¼ দিন হিসাবে বৃদ্ধি করিলে, সাবন মতে বার বৎসর হয়। অপরে মনে করেন, মাস শব্দই দ্বাদশ বুঝায়। তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে, তাঁহাদের ব্যাখ্যা সত্য হইলে, মূলের 'এক' শব্দ নিরর্থক হয় ; এবং একবচনান্ত 'সংবৎসরং' পদের উপপত্তি হয় না।

এইরূপে দেখা যায়, নীলকণ্ঠ ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের ব্যাখ্যা মতে, অর্জ্জুন দ্বারকা গমনের পূর্ব্বেই বনবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল, বার বৎসর, পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। কারণ, মহাভারতের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, অর্জ্জুন বৎসরাধিক ("সংবৎসরপরাঃ") কাল দ্বারকায় বাস করেন। তদনন্তর কিছুকাল পুষ্করে থাকিয়া, বনবাসের দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ করেন।[১] সুতরাং দ্বারকায় গমনের পূর্ব্বে এগার বৎসরের কম এবং দশ বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই মহাভারতের মূলোক্তির ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই বিষয়ে কোন প্রকার মতদ্বৈধ হইতে পারে না। নীলকণ্ঠ এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারের ব্যাখ্যায় সেই সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। সেই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

যদিও নীলকণ্ঠের অনুসরণে স্বীকার করা যায় যে, পূর্ণ = ১০, তবে 'সংবৎসরং পূর্ণং মাসঞ্চৈকং' বাক্যের অর্থ হইবে 'দশ বৎসর এক মাস'। এই মতে, অর্জ্জুন দশ বৎসর এক মাস বনবাসের পর দ্বারকায় গমন করেন। ইহাতে মহাভারতের পূর্ব্বাপর সমস্ত উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত পূর্ণ = ১০, ব্যবহার কোথাও দেখি নাই।[২] সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয় ; জন্ম ১০৩৬ শকাব্দ)-কৃত 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'তে পাওয়া যায় পূর্ণ = ০। মহাভারতের যুগে পূর্ণ শব্দ যে দশ সংখ্যা খ্যাপন করিত, তাহার

১। "উষিত্বা তত্র কৌন্তেয়ঃ সংবৎসরপরাঃ ক্ষপাঃ ॥ ১৩ ॥
বিহৃত্য চ যথাকামং পূজিতো বৃষ্ণিনন্দনৈঃ।
পুষ্করে তু ততঃ শেষং কালং বর্ত্তিতবান্ প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥
পূর্ণে তু দ্বাদশে বর্ষে খাণ্ডবপ্রস্থমাগতঃ।"

আদিপর্ব্ব, ২২১ অধ্যায়।

২। এই বিষয়ে বিশেষ জানিতে হইলে, (ক) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, "আঙ্কিক শব্দ" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২১৫-২৪৮ পৃষ্ঠা), এবং (খ) শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, "নাম-সংখ্যা" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭-২৭ পৃষ্ঠা ; বিশেষ ১৮ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

কোন প্রমাণ নীলকণ্ঠ দেন নাই ; (পূর্ব্বোক্ত অঙ্কনিঘণ্টুতে নাই। মহাভারতের অপর কুত্রাপি) আমরা পাই নাই।১ সেই কারণে এই ব্যাখ্যাও ঠিক মনে হয় না।

"সংবৎসরং পূর্ণং মাসমেকং" বাক্যের অন্বয়, 'সংবৎসরং পূর্ণম্ একং মাসঞ্চ' অথবা 'সংবৎসরং পূর্ণম্ একং মাসম্ একং চ', এই প্রকার করা সমীচীন মনে হয়। পূর্ণম্=০, একম্=১। অঙ্কস্য বামা গতিঃ। সুতরাং পূর্ণম্ একম্=১০। এইরূপে অর্জ্জুনের দ্বারকা-গমনের পূর্ব্বে দশ বৎসর দশ বা এক মাস অতিবাহিত হইয়াছিল। এই প্রকার ব্যাখ্যায় কোন অসঙ্গতি হয় না। সেই হেতু তাহা গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতে পারে না। এইরূপে দেখা যায়, মহাভারতে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব দশাঙ্ক-সংখ্যাপ্রণালীও তখন জানা ছিল।

নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা মতে, মহাভারতের অপর এক স্থলে নামসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহার আছে। শরশয্যায় শায়িত কুরুপিতামহ বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, দেহত্যাগের পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

"অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা ॥
মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি ॥" ২

এই বচনে "অষ্টপঞ্চাশতং" পদ কোন্ সংখ্যা খ্যাপন করে? নীলকণ্ঠ বলেন, ৪২। 'অষ্টপঞ্চাশতং' = অষ্টপঞ্চ + অশতং = ১০০—অষ্টপঞ্চ ; অষ্টপঞ্চ = ৫৮ ; সুতরাং অষ্ট-পঞ্চাশতং = ১০০ − ৫৮ = ৪২। তিনি মনে করেন, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতেই হইবে। নতুবা, মহাভারতের (তথা ভারত-সাবিত্রীর) বিভিন্ন উক্তিসমূহের পরস্পর সঙ্গতি হয় না।

"তথা 'অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ' ইতি ভীষ্মবচনং তু 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' 'ত্রিভাগমাত্র(?-শেষঃ)পক্ষোঽয়ং' ইতি বাক্যশেষানুসারাৎ অশতং শতহীনং যথা স্যাত্তথা অষ্টপঞ্চ অষ্টপঞ্চাশদ্রাত্রয়ো ব্যতীতা ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। বিলোমশোধনাৎ অষ্টপঞ্চাদূনং শতং রাত্রয়ো দ্বাচত্বারিংশদ্রাত্রয়ো ব্যতীতা ইত্যর্থঃ। তথা চ পৌষকৃষ্ণাষ্টমীতো মাঘশুক্লপঞ্চম্যাং তাবতী দিনসংখ্যা পূর্য্যতে, পক্ষস্য চ তৃতীয়ো ভাগো গতো ভবতি ; তত্রাপোকতিথিক্ষয়াৎ পঞ্চম্যাঃ দ্বিচত্বারিংশত্ত্বমত্বং জ্ঞেয়ম্" ইত্যাদি।৩

১। মহাভারতের কোন কোন স্থানে নাম-সংখ্যা ব্যবহারের দু-একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, কৃতি =৪ (শান্তিপর্ব্ব, ৩৪২।৯১) ; চতুঃষষ্টি = কলা (সভাপর্ব্ব, ৬১-৯, "চতুঃষষ্টিবিশারদ")। এইটা সম্পূর্ণ বৈদিক প্রয়োগ। বস্তুনির্দ্দেশার্থ সংখ্যা ব্যবহার বেদার্ব্বাক্ সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ভীম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া শিশুপালের রাজধানীতে 'ত্রিদশ' রাত্রি ("ত্রিদশাঃ ক্ষপাঃ", সভাপর্ব্ব, ২৯।১৬) বাস করেন। ত্রিদশ = ত্রি + দশ =১৩ (নীলকণ্ঠ) ; ত্রি × দশ = ৩০ (কালীপ্রসন্ন সিংহ)। আমাদের মনে হয়, ত্রিদশ = ৩৩। কেন না, ত্রিদশ বা দেবতার সংখ্যা ৩৩।

২। অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৭।২৭-৮

৩। ভীষ্মপর্ব্ব, ১৭।২-৩ শ্লোকের টীকা দেখ।

এই ব্যাখ্যা সত্য হইলে, স্থানীয়মানযুক্ত নামসংখ্যা প্রয়োগের আর একটা দৃষ্টান্ত মহাভারতে পাওয়া যায়। কিন্তু নীলকণ্ঠ স্বয়ং পূর্ব্বাপর ব্যাখ্যা মানেন নাই। অপরত্র তিনি বলিয়াছেন, 'অষ্টপঞ্চাশতং'=৫৮। (পরে দেখুন)। আধুনিক লেখকেরাও সেই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।১ তাহাই সঙ্গত মনে হয়। বেদের শাখা নির্দ্দেশকালে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, যজুর্ব্বেদের শাখার সংখ্যা "ষট্‌পঞ্চাশতমষ্টৌ চ সপ্তত্রিংশত-মিত্যুত।"২ অর্থাৎ ৫৬+৮+৩৭=১০১। 'ষট্‌পঞ্চাশতং'=৫৬, সপ্তত্রিংশতং=৩৭, এই প্রকার ব্যাখ্যা না করিলে যজুর্ব্বেদের শাখার সংখ্যা সম্বন্ধে মহাভারতের উক্তি ভুল হয়।

দেখা যায়, আসল কথা আরও দুরূহ। 'অষ্টপঞ্চাশতং' পদের অর্থ ৪২, কি ৫৮, যাহাই করা যাউক না কেন, কিছুতেই ভীষ্মের শরশয্যা-সম্পর্কিত মহাভারতোক্তিসমূহের সঙ্গতি হয় না। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইতেছি। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে বীরবর ভীষ্মের পতনের পর যুদ্ধ আট দিন চলিয়াছিল। ইহা সর্ব্বজনবিদিত। যুদ্ধ শেষ হইলে বিজয়ী পাণ্ডবগণ অশৌচ নিমিত্ত এক মাস হস্তিনাপুরের বাহিরে গঙ্গাতীরে বাস করেন—

"তত্র তে সুমহাত্মানো ন্যবসন্ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়িষান্তো মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ॥"৩

তদনন্তর তাঁহারা পুরমধ্যে প্রবেশ করতঃ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, শ্রাদ্ধ দান, এবং প্রজাসান্ত্বনাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সমস্ত কার্য্যে কত দিন ব্যতীত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ মহাভারতে নাই। যাহা হউক, কিছু দিন পরে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে মহাত্মা ভীষ্মকে দর্শন করিতে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। তথায় তিনি বলিলেন,

"পঞ্চাশতং ষট্ চ কুরুপ্রবীর
শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য।
ততঃ শুভৈঃ কর্ম্মফলোদয়ৈস্ত্বং
সমেষ্যসে ভীষ্ম বিমুচ্য দেহম্॥"৪

* * * *

১। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, "দুইটি মহাভারতীয় প্রশ্ন" (প্রবাসী, ৩২শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ২৩০-৫ এবং ৩৭৯-৮০ পৃষ্ঠা); শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, "মহাভারতের যুদ্ধকাল নির্ণয়" (ভারতবর্ষ, ২০শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩৩৯, ৫৮১—৭ পৃষ্ঠা; বিশেষভাবে, ৫৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২। শান্তিপর্ব্ব, ৩৪২।৯৮

৩। শান্তিপর্ব্ব, ১।২

৪ নীলকণ্ঠ বলেন, "তত্র গঙ্গাতীরে পুরাদ্বহির্ম্মাসমাত্রবাসস্য প্রয়োজনন্ত যৎ কচিচ্ছদ্মযুদ্ধং কৃতং তজ্জন্যদোষ-নির্হরণেন শুদ্ধিসম্পাদনম্। তদেতদুক্তং শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়িষান্ত ইতি। ন তত্র শাবাশৌচশুদ্ধির্ম্মাসমাত্রেণেতি বিবক্ষিতম,..."দ্বাদশাহেন ভূপতিঃ।"...ইতি মনুবাক্যবিরোধাৎ।...কিঞ্চ...সংগ্রামহতানাং সপিণ্ডাঃ সদ্য এব শুধ্যন্তীত্যুক্তং মনুনা। তেন দ্বাদশাহমপি নৈষামশৌচং মাসস্তু দূরতো নিরস্ত ইতি প্রতীয়তে। যথা সৌপ্তিকে পশুবদ্ধতানাং সুহৃদাং দ্বাদশাহমশৌচমস্তি তেন যুদ্ধদিনেষষ্টাদশাহপর্য্যন্তং প্রত্যহমাশৌচপ্রাপ্তিঃ সদ্যঃ শুদ্ধিস্মৃতদিনে প্রাপ্তস্যাশৌচস্য দ্বাদশাহেন নিবৃত্তিরিতি মাসং শৌচসম্পাদনোক্তির্যুজ্যতে।"

ব্যাবর্ত্তমানে ভগবত্যুদীচীং
সূর্য্যে জগৎকালবশং প্রপন্নে।
গন্তাসি লোকান্ পুরুষপ্রবীর
নাবর্ত্ততে যানুপলভ্য বিদ্বান্॥ ১৬॥"১

অত্রস্থ "পঞ্চাশতং ষট্ চ" বাক্যোক্ত সংখ্যা, নীলকণ্ঠের মতে, ৩০। তিনি বলেন,

"পঞ্চাশতং ষট্ চেতি তব জীবিতসম্বন্ধিনাং দিনানাং শেষং পঞ্চষট্ চ পঞ্চবারমাবর্ত্তিতাঃ ষড়িতি রীত্যা ত্রিংশদিতি জ্ঞেয়ং তাবদেব আশতং শতাবধি যদ্দিনানাং শতেন কর্ত্তুং শক্যং তত্রিংশতাপি কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। 'অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শযানস্যাদ্য মে গতা' ইতি ভীষ্মো বক্ষ্যতি। তত্র ত্রিংশদতঃ পরং শিষ্টা অষ্টাবিংশতিরিতঃ পূর্ব্বং ব্যতীতা"। তথাহি ভীষ্মস্য শরতল্পশয়নান্তরমষ্টৌ দিনানি যুদ্ধং ততো দুর্য্যোধনাশৌচং যুযুৎসোঃ ষোড়শদিনানি তেন সহ পুরং প্রবিশতাং পাণ্ডবানামপি তাবন্তি দিনানি গতানি। পঞ্চবিংশে সর্ব্বেষাং শ্রাদ্ধদানম্। ষড়্‌বিংশে পুরপ্রবেশঃ। সপ্তবিংশে রাজ্যাভিষেকঃ। অষ্টাবিংশে প্রকৃতিসান্ত্বনমাভ্যুদয়িকং দানঞ্চ। ঊনত্রিংশে ভীষ্মং প্রত্যাগমনং। তদ্দিনমারভ্য ত্রিংশদ্দিনানি শিষ্টানীতি জ্ঞেযম্।"

এই ব্যাখ্যার দুই স্থলে নীলকণ্ঠ আত্মবিরোধ করিয়াছেন। এখানে তিনি লিখিয়াছেন, 'অষ্টপঞ্চাশতং'=৫৮। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'অষ্টপঞ্চাশতং'= ১০০−৫৮=৪২। এ স্থলে তিনি বলিয়াছেন, পাণ্ডবেরা ষোল দিন গঙ্গাতীরে থাকিয়া অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা 'মাসমাত্র' অশৌচ পালন করেন। তাহা মূল মহাভারতেরই উক্তি। নীলকণ্ঠও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আবার বিকল্পে দেখাইয়াছেন, যুদ্ধের আঠার দিন লইয়াই এক মাস। সুতরাং, ব্যাখ্যান্তর মতে, তাঁহারা অশৌচ রক্ষার্থ প্রকৃত বার দিনই গঙ্গাতীরে বাস করেন। তার পর এইখানে উক্ত হইয়াছে, শ্রাদ্ধদান পুরপ্রবেশের পূর্ব্বে হয়। কিন্তু মূলে দেখা যায়, শ্রাদ্ধক্রিয়া পুরপ্রবেশ এবং রাজ্যাভিষেকের পরে হয়।

ভীষ্মের ধর্ম্মোপদেশ শেষ হইলে, ভগবান্ ব্যাসের পরামর্শে, মহারাজ যুধিষ্ঠির, পিতামহের অনুমতি লইয়া, হস্তিনানগরে চলিয়া যান। তথায় তিনি রাজ্য শাসনাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। "পঞ্চাশ রাত্রি" ব্যতীত হইলে, উত্তরায়ণ-সমাগম দেখিয়া, তিনি ভীষ্মের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

"উষিত্বা শর্ব্বরী' শ্রীমান্ পঞ্চাশন্নগরোত্তমে।
সময়ং কৌরবাগ্রস্য সম্মার পুরুষর্ষভঃ॥"২

সেই দিনেই মহাত্মা ভীষ্ম নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

মহাভারতের যুগে,—শককালের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে—হিন্দুগণ সংখ্যা খ্যাপনার্থ কোনরূপ অঙ্ক ব্যবহার করিতেন কি না, কেহ কেহ তদ্বিষয়ে সন্দেহ করেন। তাঁহাদের প্রত্যয়ের জন্য আমরা মহাভারত হইতে স্বতন্ত্র প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

বনবাসকালে পাণ্ডবগণ একদা দ্বৈতবনে কোন এক সরোবরের তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় দুর্য্যোধন—কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে, একবার দ্বৈতবনে গমন করেন।

১। শান্তিপর্ব্ব, ৫১ অধ্যায়। ২। অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৭।৫।

তাঁহাদের গূঢ় অভিপ্রায় ছিল, পাণ্ডবগণের দৈন্যাবস্থা দর্শন করিয়া তৃপ্তি অনুভব করা। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি সংগ্রহের জন্য তাঁহারা মৃগয়া ও ঘোষযাত্রার ছল করেন। কর্ণ এবং শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইলেন,

"স্মারণে সময়ঃ প্রাপ্তো বৎসানামপি চাঙ্কনম্।" ১

"স্মারণের এবং (নূতন) বৎসসমূহকে অঙ্কনের সময় হইয়াছে।" স্মারণ এবং অঙ্কন কাহাকে বলে, পরে প্রতীত হইবে। নীলকণ্ঠ বলেন, "স্মারণে স্মারণহেতৌ কর্ম্মণি গবাং সংখ্যাপূর্ব্বকং বয়োবর্ণজাতিনাম্না লেখনে।"

যাহা হউক, ঐ ছলে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া দুর্য্যোধন অমাত্য ও সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে গমন করেন। তথায়,

"দদর্শ স তদা গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অঙ্কৈর্লক্ষৈশ্চ তাঃ সর্ব্বা লক্ষয়ামাস পার্থিব॥
অঙ্কয়ামাস বৎসাংশ্চ জজ্ঞে চোপসৃতাস্ত্বপি।
বালবৎসাশ্চ যা গাবঃ কা(? ক)লযামাস তা অপি॥
অথ স স্মারণং কৃত্বা লক্ষয়িত্বা ত্রিহায়নান্।
বৃতো গোপালকৈঃ প্রীতো ব্যহরৎ কুরুনন্দন॥"২

"তখন তিনি শতে শতে ও হাজারে হাজারে গরু দেখিলেন। অঙ্ক ('অঙ্কৈঃ') এবং চিহ্ন ('লক্ষৈঃ') দ্বারা রাজা সেই সকলের পরিচয় জানিলেন। অনন্তর (নূতন) বৎসসমূহকে অঙ্কিত করিলেন। তন্মধ্যে দমনাই ও বাল বৎসসমূহকে পৃথক্ভাবে গণনা করিলেন। তিন বৎসরবয়স্ক গোসমূহের সংখ্যাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন। এইরূপে স্মারণ করিয়া, কুরুনন্দন গোপালকগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন।"

এই বর্ণনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, স্মারণ অর্থ—সংখ্যান বা সংখ্যা পরিগণনা। ইংরাজী ভাষাতে যাহাকে 'সেন্‌সাস' বলে, স্মারণ বস্তুত তাহাই। সুতরাং নীলকণ্ঠের গৃহীত অর্থ ঠিকই।

এখন দেখিতে হয়, অঙ্কন কি? সংস্কৃত 'অঙ্ক' শব্দের সাধারণ অর্থ 'চিহ্ন'। 'লক্ষ' শব্দের সাধারণ অর্থও ঠিক তাহাই। উপরে অনূদিত মহাভারতোক্তিতে 'অঙ্ক' এবং 'লক্ষ' উভয় শব্দই এই একই সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যেহেতু, একই সাধারণ অর্থ হইলে গ্রন্থকার পর পর দুইটা শব্দ প্রয়োগ করিতেন না। অধিকন্তু তাঁহার 'চ' শব্দ ব্যবহার দ্বারা নিশ্চিত হয় যে, তিনি 'অঙ্ক' এবং 'লক্ষ' শব্দকে ভিন্নার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। 'অঙ্ক' শব্দের বিশেষ অর্থ 'সংখ্যা-চিহ্ন'। যেমন হিন্দু-গণিতশাস্ত্রে দেখা যায়। 'লক্ষ' শব্দের বিশেষ অর্থ 'লক্ষ-সংখ্যা'। উক্ত অনুবচনে 'লক্ষ' শব্দ এই বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে, অঙ্ক শব্দ তথায় 'সংখ্যা-চিহ্ন' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ অঙ্ক দ্বারা দুর্য্যোধন গো-সংখ্যা জানিতে

১। বনপর্ব্ব, ২৩৮।৪ ২। ঐ, ২৩৯।৪-৬

পারিয়াছিলেন। তাহাও ঐ ব্যাখ্যার অনুকূলে বিশেষ যুক্তি। অঙ্কন অর্থ সংখ্যা-স্থাপন। গোপৃষ্ঠে অঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে অপর চিহ্ন ('লক্ষ')ও দেওয়া থাকিত। তদ্দ্বারা গরুর জাতি বর্ণ ইত্যাদির পরিচয় নির্দ্দেশিত হইত। গো-শরীরে নানাপ্রকার পরিচায়ক 'লক্ষণ'[১] বা 'লক্ষ্ম'[২] দেওয়ার প্রথা অতি প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। মৈত্রায়ণী-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, রেবতী নক্ষত্রে চিহ্ন প্রদান প্রশস্ত। কেন না, ঐ নক্ষত্র ধনদায়ক[৩]।

মহাভারতে দেখা যায়, তখনকার রাজাদের গো-সংখ্যা কার্য্যের জন্য এক এক জন আধিকারিক থাকিতেন। তাঁহাকে "গো-সংখ্যাতা"[৪] বা "গো-সংখ্য"[৫] বলা হইত। দোহন, লালন-পালন, সেবা, চিকিৎসা, রক্ষণাবেক্ষণাদি গোসম্বন্ধীয় অপরাপর যাবতীয় কার্য্যেরও ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত। অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব বিরাট-রাজের 'গো-সংখ্যাতা'রূপে ছিলেন। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের "গো-সংখ্য" ছিলেন বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। "প্রতিষেদ্ধা চ দোগ্ধা চ সংখ্যানে কুশলো গবাম্।"[৬] এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তখন গো-অঙ্কনের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রণালী ছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

১। গোভিলগৃহ্যসূত্র, ৩।৬।৫　২। অথর্ব্ববেদ, ৬।১৪১।২　৩। মৈত্রায়ণী সংহিতা, ৪।২।৯
৪। বিরাট পর্ব্ব, ৩।৮　৫। ঐ, ১০।৫, ১০　৬। ঐ, ৩।৮

কৃত্তিবাসের জন্ম-শক

(আলোচনা)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৪০ সনের তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃত্তিবাসের জন্ম-শক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বার বার তিন বারের গণনার ফলে ঠিক করিয়াছিলেন যে, ১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ তারিখে রবিবার শ্রীপঞ্চমীর দিন কৃত্তিবাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (সা-প-প, ১৩৪০, ১ম সংখ্যা)। আলোচ্য প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমার অনুরোধ ও নির্দ্দেশ মত এই গণনা হয় বলিয়া, বসন্তবাবুর সন্দেহের জবাব আমারই দেওয়া উচিত, তাই দিতেছি।

১। রাজা কংসনারায়ণের সময়।

কংসনারায়ণের সময় সঠিক্ নির্ণয় করিবার উপকরণ আমার জানা নাই, তাহিরপুর রাজ-পরিবারের প্রাচীন সনদগুলি অনুসন্ধান করিলে হয় ত মিলিতে পারে। যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই যথাসম্ভব চেষ্টা করা যাউক। শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু বলেন,—"পরলোকগত ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রাজা গণেশের অল্পকাল পরে রাজা কংসনারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন ; এবং হোসেন শাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়ের মসনদে সমাসীন দুর্ব্বল হাবসী নৃপতিগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসরে উত্তর-বঙ্গের অনেকখানি অধিকার করিয়া স্বরাজ্য-ভুক্ত করেন। কৃত্তিবাস ইহাঁকেই গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন। গৌড়ের ইতিহাসলেখকের অভিপ্রায়ও তাহাই।" বলা বাহুল্য, প্রমাণাভাবে কালীপ্রসন্ন বাবুর মতেরও কোন সার্থকতা নাই, গৌড়ের ইতিহাসকারের মতেরও কোন সার্থকতা নাই। ঐতিহাসিক-আলোচনা-প্রণালী-গ্রাহ্য প্রমাণপ্রয়োগ ভিন্ন ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় অসম্ভব।

তিনখানা মুদ্রিত পুস্তক হইতে তাহিরপুরের বংশাবলী উদ্ধৃত করিলাম।

৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-সঙ্কলিত কুলশাস্ত্র-দীপিকা, ২৫৩ পৃষ্ঠা	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবিবরণ, ২২৩ পৃষ্ঠা	৺লালমোহন বিদ্যানিধি-সঙ্কলিত সম্বন্ধ-নির্ণয়, ৬৪৯ পৃষ্ঠা
১। কামদেব ভট্ট	১। কামদেব ভট্ট	১। কামদেব ভট্ট
২। বিজয় লস্কর	২। বিজয় লস্কর	২। পুত্র (নামোল্লেখ নাই)
৩। হরিনারায়ণ	৩। উদয়নারায়ণ	৩। উদয় (নারায়ণ)
৪। কংসনারায়ণ	৪। হরিনারায়ণ	৪। হরিনারায়ণ
৫। ইন্দ্রজিৎনারায়ণ	৫। কংসনারায়ণ	৫। কংসনারায়ণ
৬। সূর্য্যনারায়ণ	৬। ইন্দ্রজিৎ (নারায়ণ)	
৭। লক্ষ্মীনারায়ণ	৭। সূর্য্যনারায়ণ	
	৮। লক্ষ্মীনারায়ণ	

কুলশাস্ত্র-দীপিকায় বিজয় লস্করের পুত্র উদয়নারায়ণের নাম বাদ পড়িয়াছে, অপর দুইখানি গ্রন্থে উহাঁর নাম থাকায় উহাঁকে কংসনারায়ণের পিতামহ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যাহা হউক, এই নামে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কংসনারায়ণ হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ পর্য্যন্ত নামগুলি প্রথম দুই গ্রন্থে এক ভাবেই আছে। এই পারম্পর্য্য বারেন্দ্রকুলশাস্ত্র-সম্মত।

তাহিরপুর-রাজবংশের আদি ইতিহাস তাঁহাদের ঘরে রক্ষিত সনদাদি দৃষ্টে এ পর্য্যন্ত কেহ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। রাজসাহী গেজেটিয়ারে দেখা যায়, কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপক্রমে তাহিরপুরের ম্যানেজার কর্ত্তৃক রাজবংশের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বোর্ড অব রেভিনিউতে প্রেরিত হইয়াছিল। এই বিবরণ মতে কংসনারায়ণের পুত্র (নাম উল্লেখ নাই) দিল্লিতে যাইয়া, বাদশাহের আদেশমত বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া, পিতাকে বন্দী করিয়া দিল্লি লইয়া যান এবং জমীদারীর ৫২ পরগণা পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেন। কংসনারায়ণের পৌত্র ইন্দ্রজিৎ. টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তে (১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে) সাহায্য করাতে, তাহিরপুরের ৫২ পরগণার বন্দোবস্ত তিনিই লাভ করেন। ইন্দ্রজিতের পুত্র সূর্য্যনারায়ণ শাহ সুজার সুবেদারীর কালে তাঁহার কোপে জমীদারী হইতে বঞ্চিত হন, এবং বন্দী অবস্থায় দিল্লিতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ নবাবের কৃপায় অবশেষে শুধু তাহিরপুর পরগণাটি ফেরত পান।

কুলগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পাই যে, ইন্দ্রজিৎ কংসনারায়ণের পৌত্র নহেন—পুত্র। কাজেই পিতা পুত্রে বিরোধ একটা হইয়া থাকিলে কংস ও ইন্দ্রজিতের মধ্যেই হইয়া থাকিবে। সুজার বাঙ্গালায় সুবেদারীর তারিখ ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। মধ্যে দুই বৎসর তিনি বাঙ্গালায় ছিলেন না। সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তের তারিখ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ (Fifth

Report—Madras Edition, 1883, পৃঃ ২৪৬) অর্থাৎ সুজার পতনের পরে আওরঙ্গজীবের রাজত্বে উহার প্রচলন হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, দ্বিতীয় বার বাঙ্গালার সুবেদার হইয়া আসিয়া ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কোন বছরে সুজা বাঙ্গালার জমীদারগণের সহিত বন্দোবস্তে হাত দেন এবং তাহিরপুররাজ সূর্য্যনারায়ণের সহিত সম্ভবতঃ তখনই তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। সূর্য্যনারায়ণের পতন যদি প্রায় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে হয় এবং তাঁহার পিতা ইন্দ্রজিৎ যদি ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে জমীদারী লাভ করিয়া থাকেন, তবে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কংসনারায়ণের অভ্যুদয় ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ মারা যান এবং শূরবংশের বাঙ্গালার সুবেদার মুহম্মদ খাঁ শূর বাঙ্গালা দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। চৈতন্যদেব হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩ হইতে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কাজেই প্রেমবিলাসের অন্যান্য অনেক উক্তির মত--

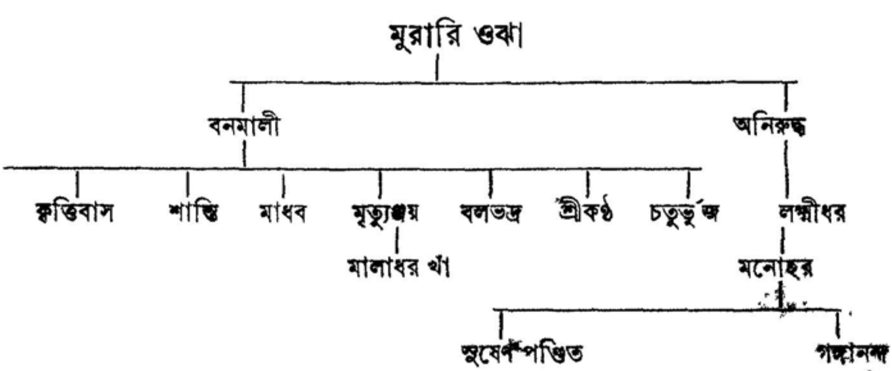
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যবে হৈলা আবির্ভাব।
সে সময়ে রাজা কংসনারায়ণের প্রভাব ॥—চতুর্ব্বিংশ বিলাস।

এই উক্তিটিও কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

কংসনারায়ণের অভ্যুদয়কাল ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ=১৪৭২ শকাব্দ। ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় যে পুথি হইতে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণটি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার তারিখ ছিল ১৪২৩ শকাব্দ। কৃত্তিবাস যে কংসনারায়ণের নিঃসন্দেহ পূর্ব্ববর্ত্তী, এই বিষয়ে আর এখন সন্দেহ থাকা উচিত নহে।

২। কৃত্তিবাসের বংশধারা ও মেলবন্ধন।

নিম্নে কৃত্তিবাসের বংশলতা প্রদত্ত হইল। (ধ্রুবানন্দের মহাবংশ, বিশ্বকোষ আফিসের সংস্করণ, ৬৫ পৃঃ এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১ম খণ্ড, ২৩৭ এবং ২৬৭ পৃষ্ঠা)।



এই বংশাবলি পর্য্যালোচনা করিয়া, পরে নিম্নলিখিত তথ্যগুলির বিচার করিতে হইবে।

১। ধ্রুবানন্দ মিশ্র ১৪০৭ শকে 'মহাবংশ' রচনা করেন এবং ১৪০২ শকে দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করেন।

২। কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খাঁ "মালাধর খাঁনী" মেলের প্রকৃতি এবং খুড়তত ভাইর নাতি গঙ্গানন্দ "ফুলিয়া" মেলের প্রকৃতি। এই দুই জন ১৪০২ শকে প্রাপ্তবয়স এবং সমাজের নেতা। ইহার ১০।১২ বছর আগে কৃত্তিবাসের মৃত্যু হইয়াছে ধরিলে, কৃত্তিবাসের মৃত্যু ১৩৯০ শকে হইয়াছে এবং অন্ততঃ ৭০ বৎসর কৃত্তিবাসের জীবনকাল ধরিলে, কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩২০ শকে হইয়াছে স্থির করিতে হয়। জ্যোতিষিক গণনায়ও ঠিক এই ১৩২০ শকই পাওয়া গিয়াছে।

৩। আর একটি প্রমাণও এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। চৈতন্য মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে নীলাচলে গমন করেন। ১৫১৬ হইতে মৃত্যুকাল ১৫৩৩ পর্য্যন্ত তিনি নীলাচলেই অবস্থান করেন।১ পুরীতে স্থায়িরূপে বসিয়া তিনি ফুলিয়া হইতে যবন হরিদাসকে ডাকাইয়া পাঠান। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় হরিদাসের ফুলিয়া ত্যাগ-বিষয়ক পাঁচটি ছত্র তদীয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস," ব্রাহ্মণ কাণ্ড, প্রথম খণ্ডের ২০৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা,—

> ফুলিয়ার স্ত্রী পুরুষ সব কান্দিয়া বিকল॥
> হরিদাস প্রিয় বড় সুষেণ পণ্ডিত।
> মুরারি হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত॥
> দুর্গাবরানুজ মনোহর মহা সে কুলীন।
> তাহার নন্দন সুষেণ পণ্ডিত প্রবীণ॥

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পরিষদের ছাপা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ১৪০ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে উপরের উদ্ধৃত পাঁচ ছত্রের প্রথম ছত্রটি মাত্র আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরিষদের পুথিশালায় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের যতগুলি পুথি আছে, তাহা আমি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং পরিষদের পুথিরক্ষক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বারা খোঁজ করাইয়াছি। উহাদের একখানাতেও এই চারি ছত্র পাওয়া যায় নাই। বসু মহাশয়ের নিকট লিখিয়া উত্তর পাইয়াছি যে, তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার ঘরের কোন পুথি দেখিয়া এই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। মূল পুথি না পাওয়া পর্য্যন্ত এই চারি ছত্র সন্দেহাত্মক হইয়া রহিলেও, সময় বিচারে এই চারি ছত্র অমূলক বলিয়া মনে হয় না। হরিদাসের ফুলিয়া ত্যাগের আনুমানিক কাল ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৩৮ শকে) গঙ্গানন্দের ভ্রাতা সুষেণ পণ্ডিতকে জীবিত পাইলে, উহা মেলবন্ধনের তারিখের (১৪০২ শক) সহিত সামঞ্জস্য যুক্তই হয়। উঁহাদের পিতামহ-পর্য্যায়ের কৃত্তিবাসের জন্মশক ইহা হইতেও অনুমান করা যায়।

এই সমস্যা বিচারে কংসনারায়ণের কথা যে আসিতেই পারে না, তাহা উপরে

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—Chaitanya and His Companions, পৃঃ ৬ ও ১৫।

দেখাইয়াছি। কাজেই হিন্দু কর্ম্মচারিপূর্ণ রাজসভার অধীশ্বর রাজা গণেশের সভাতেই যে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়া, রামায়ণ রচনার আদেশ পাইয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে সন্দেহ করা নিরর্থক,—বিশেষতঃ জ্যোতিষিক গণনায় যখন, ১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী দিন রবিবার পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান-ভুক্তি*

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়, 'লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ' নামক প্রবন্ধে, বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজনৈতিক বিভাগগুলি (Administrative Division) স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রচুর শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক বহু গবেষণা করিয়া, উহাতে অনেক ভুক্তি, মণ্ডল ও চতুরকের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির দক্ষিণ ভাগের পশ্চিম সীমা ও বর্দ্ধমান-ভুক্তির দক্ষিণ অংশের পূর্ব্ব সীমা বোধ হয়, যথাযথরূপে নির্ণীত হয় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও সম্প্রতি, 'প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ' নামক প্রবন্ধে, ঐ বিভাগ দুইটীর সীমা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।১ আমি কয়েক বৎসর সুন্দরবনের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া, ঐ বিভাগ দুইটীর পূর্ব্বোক্ত সীমা যত দূর নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণ হইতে, বর্ত্তমান সময়ে হুগলী নদীর যে অংশ হাওড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্য দিয়া সাগরে মিশিয়াছে, উহাকেই গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী ধরিয়া, উক্ত বিভাগ দুইটীর সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উহা গঙ্গা নদী নহে—অধুনা লুপ্ত সরস্বতী নদীর নিম্নাংশ। পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র খাল ভাগীরথীর শাখারূপে বর্ত্তমান খিদিরপুরের নিকট আদিগঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া, শাঁকরোল নামক স্থানে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত ছিল। প্রবাদ যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনসময় ইংরাজগণ কলিকাতায় জাহাজ যাতায়াতের সুবিধার জন্য উহা প্রশস্ত করতঃ ভাগীরথীর জলরাশি ঐ পথে চালিত করিয়াছিলেন।২ গঙ্গার এই অংশ কৃত্রিম বলিয়া আজিও হিন্দুগণ উহার উপর শব দাহ করেন না এবং উহাতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের ফল হয় না বলিয়া বিশ্বাস করেন। শাঁকরোল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত খাল কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা খনিত হয়, তাহা আজিও জানা যায় নাই। ডি, ব্যারোর মানচিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও উহা বিদ্যমান ছিল।

অধুনা খিদিরপুরের প্রসিদ্ধ সেতুর নিম্ন দিয়া হুগলী নদীর যে একটী ক্ষীণ প্রবাহ, প্রথমে পূর্ব্বমুখে ও তৎপরে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে গিয়া, কালীঘাটের উপর দিয়া 'টালির নালা' বা 'আদিগঙ্গা' নদী নামে প্রবাহিত আছে, উহাই প্রাচীন কালে ভাগীরথী নদীর মূল স্রোত

---

* বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৬ই বৈশাখ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন পঠিত।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩, দ্বিতীয় সংখ্যা।

২। 'বঙ্গদেশের ভূ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী কথা,' শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত; (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীর অষ্টম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ)।

ছিল, এবং তৎকালে কালীঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত রসা নামক স্থানের পশ্চিম দিক্ দিয়া বৈষ্ণবঘাটা, রাজপুর, কোদালিয়া, মাহিনগর, দক্ষিণ-গোবিন্দপুর, বারুইপুর, শাসন সূর্য্যপুর, মুলটী, দক্ষিণ-বারাশত, সরিষাদহ, জয়নগর, মজিলপুর, জলঘাটা, ছত্রভোগ ও খাড়ী প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইত। প্রাচীন বিবরণাদির মধ্যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তীর মনসার ভাসান, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্য ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলগমন এবং চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরগণের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ঐ প্রবাহের ও উহার উভয় তীরবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত অনেক জনপদের উল্লেখ আছে।১

ভাগীরথী নদীর এই গর্ভ, মজাগঙ্গা বা 'গঙ্গার বাদা' নামে এক বিস্তৃত নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়া, পূর্ব্বলিখিত গ্রামগুলির পার্শ্বে আজিও বিদ্যমান আছে। এতদ্দেশের হিন্দু অধিবাসিগণ, এখনও গঙ্গা এখানে অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিতা হইতেছে, এই বিশ্বাসে ও বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের বিধান মতে২, এই গঙ্গার বাদানামক নিম্নভূমির উপর শবদাহ করেন এবং উহার উপর খনিত পুষ্করিণীগুলির জলও গঙ্গাজলরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন।৩

চৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই ভাগীরথী-প্রবাহ পূর্ব্বলিখিত জনপদগুলির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, ছত্রভোগের দক্ষিণ হইতে বহু শাখায় বিভক্ত ছিল এবং তখনও ঐ সমস্ত শাখা-নদী গঙ্গার শতমুখ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রাকালে ছত্রভোগের সান্নিধ্য হইতে গঙ্গার উক্ত শতমুখ দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।৪

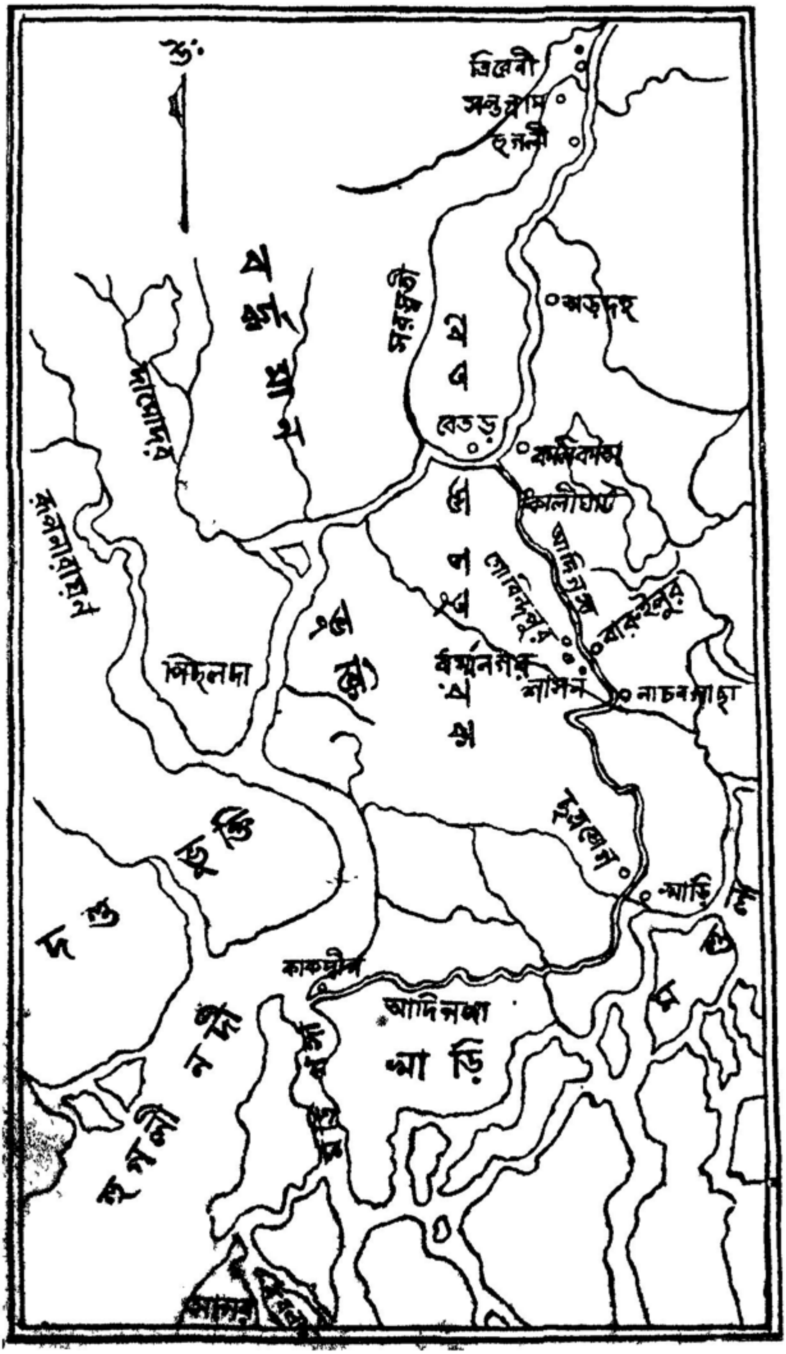
ওয়্যালি সাহেব বলেন যে, প্রবাদ—ঐ নদীগুলির মধ্যে বর্ত্তমান ১১, ১২ ও ১৪নং লাটের দক্ষিণাংশে প্রবাহিত শতমুখী ঘিবাটী গাঙ্ বা ঘুঘুডাঙ্গা নদী ভাগীরথীর উক্ত মূল প্রবাহের অংশ। তাঁহার মতে উহা কাকদ্বীপের নিম্ন দিয়া বর্ত্তমান সাগর-দ্বীপের পূর্ব্বে প্রবাহিত

১। মল্লিখিত The Antiquities of the North-West Sundarbans, V. R. Society's Monographs, No. 4, পৃঃ ৩, ৪, ১২, ১৫-১৭।

২। "প্রবাহমধ্যে বিচ্ছেদেতু অন্তঃসলিলপ্রবাহিত্বান্ন দোষঃ।
অন্যথা ইদানীং গঙ্গায়া সাগরগামিত্বানুপপত্তেঃ।"
প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, গঙ্গামাহাত্ম্য।

৩। Bengal District Gazeteer, Vol. XXXI, পৃঃ ৭-৮।

৪। "ছত্রভোগে গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে॥
দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
হরি ধ্বনি হুঙ্কার করেন কোলাহল॥"—চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড।


ত্রিবেণী
সপ্তগ্রাম
হুগলী
আড়দহ
সরস্বতী
দামোদর
বেতড়
কলিকাতা
কালীঘাট
আদিগঙ্গা
গোবিন্দপুর
বারুইপুর
পিছলদা
নাচনগাছা
কাকদ্বীপ

মডিগঙ্গা নদীতে পড়িয়া সাগর-দ্বীপের অন্তর্গত ধবলাটের পশ্চিম দিক্‌স্থ নদীর খাড়ি দিয়া প্রথমে পশ্চিমমুখে ও পরে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিশিয়াছিল।১ এই জন্যই এক্ষণে ধবলাটের পশ্চিমদিক্‌স্থ নদীর মোহনায় প্রতিবৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে বিখ্যাত গঙ্গাসাগরের মেলা বসিয়া থাকে।

গোবিন্দপুরে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের যে তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তিনি বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ডচতুরকের অধীন বিড্ডর শাসন নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব-শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উহাতে প্রদত্ত ভূমির নিম্নলিখিতরূপ চতুঃসীমা দেওয়া আছে,—

উত্তর—ধর্ম্মনগরী সীমা।
পূর্ব্ব—জাহ্নবী অর্দ্ধসীমা।
দক্ষিণ—লেংঘদেবমণ্ডপী সীমা।
পশ্চিম—ডালিম্বক্ষেত্র সীমা।২

এই চতুঃসীমা হইতে বুঝা যায় যে, বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ডচতুরক নামক বিভাগ, পূর্ব্বদিকে জাহ্নবী বা ভাগীরথী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত বেতড্ড বর্ত্তমান হাওড়া জিলার অন্তর্গত বেতড় নামক স্থান এবং উহারই নামানুসারে ঐ চতুরক প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসনে উল্লিখিত বিড্ডরশাসন নামক গ্রামখানি কোথায় ছিল, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে গোবিন্দপুরের অনতিদূরে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের ডায়মণ্ডহারবার শাখার বারুইপুর ষ্টেশনের সন্নিকটে, শাসন নামে একখানি গ্রাম আছে। উহাই বোধ হয়, প্রাচীন কালে বেড্ডরশাসন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ধর্ম্মনগর নামে একটী জনপদ ও পূর্ব্বদিকে মজাগঙ্গা নামে জাহ্নবী নদীর পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক খাদ এখনও বর্ত্তমান আছে। এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

এই শাসন গ্রামের অবস্থান হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, সেনরাজত্বকালে বর্দ্ধমানভুক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত আদিগঙ্গা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বর্ত্তমান চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত বেহালা, বিষ্ণুপুর, বজবজ, ফলতা, মগরাহাট, ডায়মণ্ডহারবার ও কুলপি থানার সমগ্র অংশ ও আলিপুর, বারুইপুর, জয়নগর ও মথুরাপুর থানার কিয়দংশ, যাহা উক্ত আদিগঙ্গা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত, বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ডচতুরকের অধীন ছিল।

শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয়, তাঁহার উল্লিখিত প্রবন্ধে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত খাড়ী-মণ্ডলের দক্ষিণাংশের পশ্চিম সীমা হুগলী নদী পর্য্যন্ত ধরিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয়

১। Bengal District Gazeteer, Vol. XXXI, পৃঃ ৮।

২। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার-সঙ্কলিত Inscriptions of Bengal. ৩য় খণ্ড, ...

পূর্ব্বোক্ত ঘিবাটী গাঙ্ পর্য্যন্ত আদিগঙ্গা নদী ও তন্নিম্নে বর্ত্তমান মড়িগঙ্গা নদী উহার পশ্চিম সীমা ছিল এবং উহা চব্বিশপরগণা জেলার ১ নম্বর হইতে ১৭ নম্বর ও ১৯ নম্বর হইতে ২১ নম্বর লাট বাদে, অবশিষ্ট সমগ্র দক্ষিণাংশ প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল।১

শ্রীকালিদাস দত্ত

---

১ Map in the V. R. S. Monographs, No. 4.

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদি বাসস্থান

প্রচলিত প্রবাদানুসারে বঙ্গের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। ইহাদের প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহ এই প্রবাদ সমর্থন করে না। কুলজী মতে ইহাদের পূর্ব্ববাসস্থান ছিল কোলাঞ্চ। কোলাঞ্চ ও কান্যকুব্জ কি এক স্থান? যদি না হয়, তবে কোলাঞ্চ কোথায় ছিল, এতৎসম্বন্ধে আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীনতম কুলগ্রন্থকারগণের মধ্যে হরিমিশ্র অন্যতম। তিনি লিখিয়াছেন,—

"কোলাঞ্চদেশতঃ পঞ্চ বিপ্রা জ্ঞানতপোযুতাঃ।
মহারাজাদিশূরেণ সমানীতাঃ সপত্নীকাঃ॥"

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা)

আবার অনতিপ্রাচীন বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার কুলরমায় লিখিয়াছেন,—

"আরুহ্য পঞ্চ তুরগানসিবাণতূণকোদণ্ডরমাকবচাদিশরীরবেশাঃ।
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতা হি গৌড়ে রাজাদিশূরপুরতো জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ॥"

(ঐ, ১০৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা)

রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থানুসারে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সকলেই কোলাঞ্চ হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মধ্যে এতদ্বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে যে, পঞ্চ ব্রাহ্মণ বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছেন। তন্মধ্যে একমাত্র কাশ্যপগোত্রীয়-দিগের বীজী পুরুষ সুষেণ কোলাঞ্চ[১] হইতে আসিয়াছিলেন। যথা,—

১। এই কোলাঞ্চ সম্ভবতঃ করঞ্জ হইবে। ১৪১৫ শকে (শরবিধুমনুভিঃ শকস্য বর্ষে) অর্থাৎ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত করঞ্জগাঞি চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য-লিখিত হরিচরিত কাব্যে দেখিতে পাই, স্বর্ণরেখ নামক বিপ্র নৃপ ধর্ম্মপাল হইতে বারেন্দ্রে করঞ্জ নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই স্বর্ণরেখের বংশে ভুদু জন্মগ্রহণ করেন। ভুন্দুর পুত্র দিবাকর আচার্য্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বারেন্দ্র কাশ্যপ গোত্রের আদি গাঞি করঞ্জ (Catalogue of Nepal Mss. No 1608 ছ)। বারেন্দ্র কুলজী গ্রন্থে দেখা যায়, স্বর্ণরেখের পৌত্র কৈতাই (ভাদুড়ি গাঞি) এবং মৈতাই (মৈত্র গাঞি) প্রথম বল্লালী কুলীন। এবং কৈতাই ভাদুড়ির পৌত্র ভন্নু (হরিচরিতের ভুন্দু)। ভন্নুর পুত্র যোগেশ্বর ভাদুড়ি ও দিবাকর করঞ্জ। সুতরাং কুলজী মতে ভাদুড়ি গাঞিই আদি এবং ইহা হইতে করঞ্জ গাঞির উৎপত্তি। আমাদের কিন্তু হরিচরিতের কথা অর্থাৎ করঞ্জ গাঞিই কাশ্যপ-গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদি গাঞি বেশী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। তবে স্বর্ণরেখ কি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্ণক এই গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে। কারণ, বল্লাল সেনের সমসাময়িক কৈতাই ভাদুড়ির পিতামহ স্বর্ণরেখ কখনই ধর্ম্মপালের সমসাময়িক হইতে পারেন না। রাঢ়ীয় প্রাচীন কুলগ্রন্থকর্ত্তা হরি মিশ্র লিখিয়াছেন যে, কাশ্যপ গোত্রে কৃষ্ণ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র তমিস্র, তৎপুত্র ওঙ্কার, তৎপুত্র স্বর্ণক তৎপুত্র শ্রীভরার্য্য, ইনিই গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন। ইঁহার পুত্রগণের নাম দক্ষ, সুষেণ ও কৃপানিধি (রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১০৬ পৃঃ)। দক্ষ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের এবং সুষেণ বারেন্দ্রগণের পূর্ব্বপুরুষ। চতুর্ভুজ সম্ভবতঃ এই

"নারায়ণাখ্যো যত্তেষাং শাণ্ডিল্যগোত্র এব সঃ।
রাজাজ্ঞয়া সমায়াতঃ গ্রামতো জম্বুচত্বরাৎ ॥২
ধরাধরো বাৎস্যগোত্রস্তাড়িতগ্রামতঃ স্বয়ম্।
সুষেণঃ কাশ্যপো জ্ঞেয়ঃ কোলাঞ্চাৎ ত্বরয়াগতঃ ॥
গৌতমাখ্যো ভরদ্বাজগোত্র ঔড়ম্বরাত্তথা।
পরাশরস্তু সাবর্ণো মন্ত্রগ্রামাৎ সমাগতঃ ॥" (ঐ, ১০৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা)

এই কোলাঞ্চ কোথায় ছিল? প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"এ দেশে কোলাঞ্চ বলিলে সাধারণতঃ সকলেই কান্যকুব্জ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন কোন সাহিত্যে, কোষগ্রন্থে অথবা শিলালিপি বা তাম্রশাসনে কান্যকুব্জের নামান্তর যে কোলাঞ্চ, সে প্রসঙ্গ আদৌ নাই।

স্বর্ণক এবং স্বর্ণরেখে গোলমাল করিয়াছেন। স্বর্ণক হইতে কৈতাই ভাদুড়ি ত্রয়োদশ পুরুষ। বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভ ১০৮২ শকে (১১৬০ খৃষ্টাব্দে) (Ind. Hist. Qly., p. 134)। আবার ধর্ম্মপালের রাজ্যারম্ভ ৭৬০ খৃষ্টাব্দে (Ind. Hist. Qly., Vol. IX, No. 2)। উভয়ের মধ্যে তফাৎ ৪০০ বৎসর। তিন পুরুষে এক শত বৎসর ধরিলে স্বর্ণক ধর্ম্মপালের সমকালবর্ত্তী হন।

২। এ স্থানে শাণ্ডিল্য নারায়ণ জম্বুচত্বর গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে; ইহাও সম্ভবতঃ ঠিক নহে। আমরা ৩য় বিগ্রহপালের আমগাছিশাসনে দেখিতে পাই, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় খোদুল শর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষগণ ক্রোড়ঞ্চি (কোলাঞ্চ) হইতে আসিয়া মৎস্যাবাস গ্রামবাসী হন। সেখান হইতে ছত্র গ্রামে বাস স্থাপন করেন। মৎস্যাবাস বা মৎস্যাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের শাণ্ডিল্য গোত্রের অন্যতম গাঞি। প্রকৃত পক্ষে আমরা প্রাচীন লিপিতে যত স্থানে কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাইয়াছি, সকলেই শাণ্ডিল্যগোত্রীয়। আবার বারেন্দ্র কুলপঞ্জীতে লিখিত হইয়াছে, ভট্টনারায়ণ কোলাঞ্চ দেশ হইতে আগমন করেন। ইঁহার পুত্র আদি-গাঞি নামক বিপ্র রাজা ধর্ম্মপালের নিকট হইতে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ধামসার গ্রাম প্রাপ্ত হয়েন (বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১৭ পৃ.)। জম্বু শাণ্ডিল্য গোত্রীয়দিগের অন্যতম গাঞি। এই জম্বু ও জম্বুচত্বর সম্ভবতঃ একই স্থান এবং খুব সম্ভব, এই জম্বুচত্বর দামোদরপুরের তাম্রশাসনে উল্লিখিত জম্বুনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রথম বল্লালী কুলীন পীতাম্বর (লাহেড়ি গাঞি) আদিগাঞি হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ। সুতরাং এই আদিগাঞিও কাশ্যপগোত্রীয় স্বর্ণকের ন্যায় ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। ইনিই প্রথম গ্রাম দান পান বলিয়াই সম্ভবতঃ ইঁহার নাম আদিগাঞি হইয়া থাকিবে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কাশ্যপ এবং শাণ্ডিল্য গোত্রীয়দিগের প্রথম গ্রাম লাভ মহারাজ ধর্ম্মপাল হইতে। সুতরাং ইঁহাদের আদিশূর মহারাজ ধর্ম্মপাল। ইহার পূর্ব্বে ইঁহারা কোলাঞ্চবাসী ছিলেন। সে কোলাঞ্চ যে এই গৌড়েই, তাহা আমরা মূল প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি। রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের আদিশূর বোধ হয় বিভিন্ন ব্যক্তি এবং রাঢ় প্রদেশের কোন রাজা। কারণ, রাজা তাঁহাদিগকে যে পঞ্চ গ্রাম দান করিয়াছিলেন, সে গ্রামগুলি উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত বলিয়াই মনে হয়। সে পঞ্চ গ্রামের নাম—কামঠী বা কামকোটী, ব্রহ্মপুরী, হরিকোট, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম (রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১১২ পৃঃ)। এই কঙ্কগ্রাম এবং মুরশিদাবাদ জেলার কাঁগ্রাম এক স্থান বলিয়াই মনে হয় (পঞ্চপুষ্প, ফাল্গুন, ১৩৩৯, ৩৭০ পৃঃ)। আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গজ কায়স্থ কুলজীগ্রন্থে রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের যে আটখানি গ্রামের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে তিনখানির নাম—হরিপুর, বটগ্রাম ও কঙ্কগ্রাম। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কতকগুলি গাঞি নামেও মিল দেখা যায়, যথা—বাৎস্যগোত্রীয় ঘোষ গাঞি। রাঢ়ীয়া বলে, ঘোষ গাঞি রাঢ় দেশে, আবার বারেন্দ্রদিগের মতে উহা বরেন্দ্র দেশে। ইহা ভিন্ন আর কতকগুলিতে নামসাদৃশ্য দেখা যায়।

শব্দরত্নাবলী অভিধানে কোলাঞ্চ দেশবিশেষ বলিয়া লিখিত আছে, অথচ কান্যকুব্জের স্বতন্ত্র উল্লেখ ও তাহার পর্য্যায়, মহোদয়, কান্যকুব্জ, গাধিপুর, কৌশ ও কুশস্থলের উল্লেখ থাকিলেও ইহার মধ্যে কোলাঞ্চ শব্দই নাই। এরূপ স্থলে কোলাঞ্চ বলিলে কিরূপে কান্যকুব্জ স্বীকার করা যায়? বামন-শিবরাম-আপ্তে তাঁহার সংস্কৃত অভিধানে কোলাঞ্চের 'name of a country of the Kalingas' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। মণিয়র উইলিয়মস্ তাঁহার বৃহৎ সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানে কোলাঞ্চ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—Name of Kalinga (the Coromandel Coast from Cuttack to Madras); but according to some, this place is in Hindustan with Kanauj for its capital অর্থাৎ কোলাঞ্চ বলিলে কলিঙ্গদেশ, কটক হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত করমণ্ডল উপকূলভাগ বুঝায়, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে উহা কনৌজ রাজধানী সমন্বিত হিন্দুস্থান মধ্যে অবস্থিত।"

কোলাঞ্চ যে প্রদেশেই হউক না কেন, দশম শতাব্দী ও তৎপরবর্ত্তী কালে ইহা যে বেদজ্ঞ সদ্ ব্রাহ্মণের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাচীন লিপিতেও পাওয়া যায়। কোলাঞ্চ হইতে ব্রাহ্মণ যে কেবল বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহা নহে; বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশেও তাঁহারা তদ্দেশীয় ভূপতিগণ কর্ত্তৃক ভূমিদানে সম্মানিত হইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

উড়িষ্যার ঢেন্‌কানল রাজ্যে দশম শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত শুল্কী-বংশীয় পঞ্চমহাশব্দ-সমধিগত মহারাজাধিরাজ জয়স্তম্ভদেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, জয়স্তম্ভদেব গোইল্লবিষয়ান্তঃপাতি কোদালকমণ্ডলে কঙ্কুলখণ্ডে চন্দ্রপুর নামক একখানি গ্রাম কোলাঞ্চবিনির্গত, শাণ্ডিল্যগোত্র আসিতদৈবলপ্রবর, ছন্দোগচরণ কৌথুম-শাখাধ্যায়ী ত্রৈবিদ্যসামান্য ভটপুত্র নির্ব্বাণের পৌত্র, খস্তের পুত্র বাবনকে দান করিয়াছিলেন[৩]। এই কোলাঞ্চ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন[৪], তাহার মর্ম্ম এই,—

বঙ্গদেশের কুলজীগ্রন্থে মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কোলাঞ্চ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা আছে। ইহার পূর্ব্বে কোন প্রাচীন লিপিতে কোলাঞ্চের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। এই স্থানের অবস্থান অনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে বহু মতবাদ আছে, কিন্তু কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

বিহারের লাহিরিয়া সরাই সহরের ছয় মাইল পশ্চিমে পাঁচোভ নামক স্থানে মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর মহামাণ্ডলিক শ্রীমৎ সংগ্রামগুপ্তের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেও কোলাঞ্চ হইতে আগত ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। এই তাম্রশাসনের সম্পাদকদ্বয় বলেন যে, ইহার অক্ষর বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তির অক্ষরের ন্যায়। সুতরাং এই তাম্রশাসনখানি দ্বাদশ শতাব্দীর বলা যাইতে পারে। ইহাতে লিখিত আছে যে, সংগ্রামগুপ্ত শাণ্ডিল্যাসিতদৈবলপ্রবর, কোলাঞ্চবিনির্গত, ভট্ট শ্রীরামের পৌত্র, ভট্ট শ্রীকৃষ্ণাদিত্যের পুত্র যজুর্ব্বেদবিদুষ আয়ুষ্মৎ বটুকভট্ট শ্রীকুমারস্বামিশর্ম্মাকে ভূমি দান করিয়াছিলেন[৫]। সম্পাদকদ্বয় লিখিয়াছেন যে, তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান হইতে প্রায় ½ মাইল

৩। J. B. O. R. S., Vol. II, p. 407.

৪। J. B. O. R. S., Vol. II, p. 5.

৫। J. B. O. R. S., Vol. V, p. 582.

পূর্ব্বে বঙ্গালিডিহি নামে একটী উচ্চ স্থান আছে। পাঁচোভ মৌজার ½ মাইল পূর্ব্বেও ঐরূপ আর একটী স্থান আছে। এই বঙ্গালিডিহি বাঙ্গালী উপনিবেশ সূচনা করিতেছে। সম্ভবতঃ এই কোলাঞ্চ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী ছিলেন তাঁহাদের বাসস্থানই বঙ্গালিডিহি নামে পরিচিত হইয়াছিল। আমাদের এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ পরে দিতেছি

আবার বঙ্গের পালরাজবংশীয় তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে লিখিত আমগাছি তাম্রশাসনে দেখিতে পাই—বিগ্রহপালদেব, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্যাসিতদৈবলপ্রবর হরিসব্রহ্মচারী, সামবেদী, কৌথুমশাখাধ্যায়ী, মীমাংসা-ব্যাকরণ-তর্কবিদ্যাবিৎ, ক্রোড়াঞ্চি-বিনির্গত-মৎস্যাবাসবিনির্গত, ছত্রাগ্রাম-বাস্তব্য, বেদান্তবিৎ, পদ্মাবনদেবপৌত্র, মহোপাধ্যায় অর্কদেবপুত্র খোদুলশর্ম্মাকে শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিতে, কোটিবর্ষবিষয়ান্তঃপাতি ব্রাহ্মণীমণ্ডলে বিষমপুর গ্রামের অংশ দান করিতেছেন[৬]।

এ স্থলে ক্রোড়ঞ্চি ও কোলাঞ্চ একই স্থান বলিয়াই মনে হয়। ক্রোড় শব্দকে বঙ্গভাষায় কোল বলে। সংস্কৃতেও ক্রোড় ও কোল সমানার্থবাচক। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের শাণ্ডিল্য-গোত্রের অন্যতম গাঞি 'মৎস্যাসী'। 'মৎস্যাবাস' ও এই মৎস্যাসীও এক। দেখা যাইতেছে, খোদুল শর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষগণ ক্রোড়ঞ্চি বা কোলাঞ্চ হইতে মৎস্যাবাস বা মৎস্যাসী এবং তথা হইতে ছত্রাগ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানায় ছত্রগ্রাম নামে একটি স্থান আছে। আবার শিবগঞ্জ থানায় ছত্র নামে একটি গ্রাম আছে[৭]। এই খোদুলশর্ম্মা যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল একাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অনুমান করা হয়।

উপরে আমরা যে তিনখানি তাম্রশাসনের আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে কোলাঞ্চের উল্লেখ থাকিলেও ইহার অবস্থান নির্ণয়ে আমাদিগকে বিশেষ কোন সাহায্য করিতেছে না। এখন আমরা আর একখানি তাম্রশাসনের কথা বলিব, যাহার সাহায্যে আমরা এ বিষয়ে সফলকাম হইবার আশা করিতে পারি।

কামরূপরাজ ধর্ম্মপালের তৃতীয় অব্দের শুভঙ্করপাটক তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"শ্রাবস্তীতে ক্রোসঞ্জ নামে একটি গ্রাম আছে—তাহাতে কলির পাপ, যাজ্ঞিকগণের হোমধূমে অন্ধ (হওয়াতে) প্রবেশ করিতে পারে নাই ॥ ১৬

সেই গ্রামে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি উদারধী কৌথুমশাখী (ব্রাহ্মণদের) প্রধান সামবেদজ্ঞদের মধ্যে অখণ্ডনীয় (প্রভাববান্) রামসদৃশ রামদেব জাত হইয়াছিলেন ॥"১৭

(কামরূপশাসনাবলী, ১৬১-১৬২ পৃষ্ঠা)

এই তাম্রশাসনের সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রামের নাম ক্রোসঞ্জ পাঠ করিয়াছেন। এই পাঠ ঠিক কি না, সন্দেহ হওয়ায় আমরা আসল তাম্রশাসনখানি দেখিয়াছি। আমাদের মনে হয়, প্রকৃত পাঠ 'ক্রোড়াঞ্চ' হইবে।" এই

৬। Ep. Ind., Vol. XV, pp. 297-298.

৭। Postal Village Directory.

শাসনখানি কলিকাতা মিউজিয়ামের আর্কিওলজিকেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিতের নিকট আছে। তাঁহার সৌজন্যেই আমরা উক্ত শাসনখানি দেখিতে পাইয়াছি। তিনি আমাদিগকে ইহার একটি ছাপও দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তিনিও বলেন ক্রোসঞ্জ পাঠ ঠিক নহে। প্রকৃত পাঠ হইবে ক্রোড়াঞ্চ। ক্রোড়াঞ্চ ও কোলাঞ্চ বা কোলাঞ্চ যে এক, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ হইবে না। পদ্মনাথবাবু এই ধর্ম্মপালকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক মনে করেন।

আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে, কোলাঞ্চ কান্যকুব্জ নহে। কেহ হয় ত বলিবেন যে, কোলাঞ্চ কান্যকুব্জ না হউক, ঐ প্রদেশের অন্তর্গত কোন স্থান হইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত কিন্তু এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যে. কান্যকুব্জ প্রদেশে কোলাঞ্চ নামে কোন স্থান ছিল বা আছে।

আপ্তে ও মণিয়র উইলিয়মস্ লিখিয়াছেন, কোলাঞ্চ কলিঙ্গের একটি নাম। সম্ভবতঃ তাঁহারা কোলাঞ্চ ও কোলাঞ্চল বা কোলাচল এক মনে করিয়া ঐরূপ লিখিয়া থাকিবেন। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, কোলাঞ্চ কলিঙ্গের অপর নাম, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, কলিঙ্গ সুপ্রসিদ্ধ এবং কোলাঞ্চ অপ্রসিদ্ধ নাম। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-কুলস্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, কেন যে সর্ব্বজনবিদিত কলিঙ্গ নাম ত্যাগ করিয়া, অপরিচিত কোলাঞ্চ নামই বার বার উল্লেখ করিতেছেন, তাহার কোন প্রকৃষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোলাঞ্চ কলিঙ্গ প্রদেশের কোন স্থান বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কেন না, প্রমাণাভাব। আর আপ্তে কিম্বা মণিয়র উইলিয়মস্‌ও তাহা বলেন না। মণিয়র উইলিয়মস্-প্রদত্ত দ্বিতীয় অর্থের মূলে যে বঙ্গে প্রচলিত প্রবাদ, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

কোলাঞ্চ যদি কান্যকুব্জ কিম্বা কলিঙ্গ না হইল, তবে ইহা কোথায়? আমরা কামরূপ ধর্ম্মপালের শুভঙ্করপাটক তাম্রশাসনে পাইতেছি,—"গ্রামঃ ক্রোড়াঞ্চনামাস্তি শ্রাবস্ত্যাং যত্র যজ্বনাং। হোমধূমান্ধকারান্ধং নাবিশৎ কলিকল্মষং॥" অর্থাৎ শ্রাবস্তীতে ক্রোড়াঞ্চ নামে একটি গ্রাম আছে, যাহাতে কলির পাপ, যাজ্ঞিকগণের হোমধূমান্ধকার দ্বারা অন্ধ হইয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই। এখন দেখা যাউক, এই শ্রাবস্তী কোথায়। শ্রাবস্তী শুনিলেই অনেকে অযোধ্যা প্রদেশের প্রসিদ্ধনামা শ্রাবস্তী (বর্ত্তমান সাহেত মাহেত) মনে করেন। ইহা ঠিক নহে। এই শ্রাবস্তী বৌদ্ধপ্রধান এবং বৌদ্ধ সাহিত্যেই ইহার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। আর আমাদের শ্রাবস্তী ব্রাহ্মণ-প্রধান এবং ব্রাহ্মণদিগের কুলস্থান। এই শ্রাবস্তীর বর্ণনায় হোমধূমের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ইহা নিশ্চয়ই বৌদ্ধপ্রাধান্যের পরিচয় দেয় না। এই ধর্ম্মপালের প্রপিতামহ ইন্দ্রপালের গুয়াকুচি তাম্রশাসনেও আমরা শ্রাবস্তীর (সাবথি) উল্লেখ পাই। যথা,—"সাবথ্যামস্তি বৈনামা গ্রামো ধাম দ্বিজন্মনাং। ধর্ম্মস্যাধর্ম্মভীতস্য দুর্গলম্ভনিভঃ কলৌ[৮]॥" অর্থাৎ সাবথিতে দ্বিজগণের বাসভূমি বৈনামক একটি গ্রাম আছে—কলিকালে তাহা অধর্ম্মভীত ধর্ম্মের সমাশ্রিত দুর্গসদৃশ। ইন্দ্রপাল এই বৈগ্রামের কাণ্বশাখী, যজুর্ব্বেদী,

৮। কামরূপশাসনাবলী, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

কাশ্যপগোত্রজ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সদৃশ পুণ্যাত্মা, সোমদেবের পৌত্র, বসুদেবের পুত্র শ্রীমান্ দেবদেব নামক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। এখানেও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও ব্রাহ্মণের কুলস্থানের বর্ণনা পাইতেছি। এই শ্রাবস্তীর উল্লেখ আমরা সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে পাইতেছি না, আর প্রথিতনামা শ্রাবস্তী বহু প্রাচীন। সুতরাং এই উভয় শ্রাবস্তী কখনই এক স্থান হইতে পারে না। এই শ্রাবস্তী ও সাবথি যে একই স্থান, তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ দেখা যায় না, যদিও শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উভয়কে বিভিন্ন স্থান প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এই দুইটি স্থানকে কামরূপের অন্তর্গত বলিয়া যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন। পরে বাধ্য হইয়া কেবল মাত্র শ্রাবস্তীকে কামরূপের প্রান্তে বঙ্গের মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাবথি পৃথক্ স্থান এবং কামরূপে। আমরা পরে দেখাইতেছি যে, উভয় স্থানই এক এবং উত্তরবঙ্গে অবস্থিত।

আমরা অন্যত্র প্রমাণ করিয়াছি যে, এই ব্রাহ্মণ-প্রধান শ্রাবস্তীর অবস্থান বঙ্গদেশের গৌড়ে[৯]। এই শ্রাবস্তীর অন্তর্গত তর্কারি নামক স্থান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের কুলস্থান ছিল। এই তর্কারির বর্ণনায়ও বেদস্মৃতির আলোচনা ও হোমধূমের কথা পাওয়া যায়; যথা,—

যেষাং তস্য হিরণ্যগর্ভবপুষ স্বাঙ্গপ্রসূতাঙ্গিরোবংশে জন্ম সমানগোত্রবচনোৎকরো ভরদ্বাজতঃ।
তেষামাযাজ্ঞনাভিপূজিতকুলং তর্কারিরিত্যাখ্যায়া শ্রাবস্তীপ্রতিবদ্ধমস্তি বিদিতং স্থানং পুনর্জ্জন্মনাং ॥২
যস্মিন্ বেদস্মৃতিপরিচয়োত্থিতস্রবৈতানগার্হ্যপ্রাজ্যাবৃত্তাহুতিষু চরতাং কীর্ত্তিভির্বেদাগ্নি শুভ্রে।
ব্যাভ্রাজস্তোপবিপরিসরদ্‌হোমধূমা দ্বিজানাং দুগ্ধাস্তোবিপ্রস্তবিলসচ্ছৈবালালীচয়াভাঃ ॥৩
তৎপ্রসূতশ্চ পুণ্ড্রেষু সকটীবাবধানবান্।
বরেন্দ্রীমণ্ডনং গ্রামো বালগ্রাম ইতি শ্রুতঃ[১০] ॥৪
ষট্‌ত্রিংশতঃ করণকস্মনিবাসপূতা আসন্ পুরঃ পরমসৌখ্যগুণাতিরিক্তাঃ।
তন্মধ্যগা বিবুধলোকমতা বরিষ্ঠা টক্কারিকা সমজনি স্পৃহণীয়কল্পা ॥২॥
সর্ব্বোপকারকরণৈকনিধেঃ স্বকীয়বংশস্য পাত্রসুভগস্য দ্বিজাশ্রয়স্য।
কল্পাবসানসময়স্থিতয়ে পুরীং যাং বাস্তুঃ স্বয়ং সমধিগম্য সমাসসাদ ॥৩॥
তস্যাং শ্রুতের্ম্মিনদশঙ্খনিনাদিতায়াং বাস্তবাবংশভবিনঙ্করণাস্ত আসন্।
আশাঃ সমস্তভুবনানি যদীয়কীর্ত্ত্যা পূর্ণানি হংসধবলানি বিশেষয়ন্ত্যা[১১] ॥৪॥

বর্ণনা-সাদৃশ্য দেখিয়া কামরূপশাসনদ্বয়ে উল্লিখিত শ্রাবস্তী এবং সিলিমপুর-প্রশস্তির শ্রাবস্তী আমাদের এক বলিয়াই মনে হয়। শ্রাবস্তীর অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে ব্রাহ্মণ গমনের কথা, নিম্নে বর্ণিত আরও কয়েকখানি লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা মনে হয় যে, গৌড়ে শ্রাবস্তী নামে কেবল যে একটি নগর ছিল, তাহা নহে; ঐ নামে একটি দেশও ছিল। অজয়গড় লিপিতে দেখা যায়, ছত্রিশখানি গ্রাম দ্বিজাশ্রয় কায়স্থগণের বাস দ্বারা পবিত্র হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই গ্রামসমূহে ব্রাহ্মণগণও বাস করিতেন।

প্রথম রণভঞ্জদেবের অষ্টপঞ্চাশত্তম বর্ষের বৌধলিপি—সাবথির (শ্রাবস্তী) অন্তর্গত

৯। Ind. Ant., Vol. LX, 1931, pp. 14-18.
১০। Silimpur Inscription, Ep. Ind., Vol. XIII, p. 290.
১১। Ajayagad Inscription, Ep. Ind., Vol. I, p. 333.

তকারিবিনির্গত ভরদ্বাজগোত্রীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী যজুর্ব্বেদচরণ শুভদাম নামক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত[১২]।

গয়াড়তুঙ্গদেবের তালচরলিপি,—বরেন্দ্রমণ্ডলে মুখরুথভট্টগ্রামবিনির্গত ওড্রবিষয়ে সাবিরভটগ্রামবাস্তব্য কাশ্যপগোত্র আবৎসার-নৈধ্রুবপ্রবর যজুর্ব্বেদচরণকণ্বশাখাধ্যায়ী পদমপুত্র দেবশর্ম্মাকে ও সাবিথি (শ্রাবস্তী)বিনির্গত যমগর্ত্তমণ্ডলবাস্তব্য বৎসগোত্রপঞ্চার্ষেয়প্রবর-যজুর্ব্বেদচরণ কণ্বশাখাধ্যায়ী লম্বরসুত বৃষ্টিদেব ও তৎপুত্র রামদেবকে প্রদত্ত[১৩]।

বিনীততুঙ্গদেবের তালচরলিপি,—পুণ্ড্রবর্দ্ধনবিনির্গত ও শ্রাবস্তীবিনির্গত ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত[১৪]।

মহাশিবগুপ্ত যযাতির পাটনা-শাসন,—শ্রাবস্তীমণ্ডলান্তর্গত কাশিলিবিনির্গত গৌতম (কৌথুম?)চরণ কৌশিকগোত্রীয় মহোদধি নামক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত[১৫]।

দ্বিতীয় মহাভবগুপ্তের কটকশাসন,—শ্রাবস্তীমণ্ডলান্তর্গত কাশিল্লিগ্রামবিনির্গত সামবেদ কৌথুমচরণ কৌশিকগোত্র রাণকরচ্ছোকে গৌড়সিমিনিল্লি নামক গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে[১৬]। এ স্থলে প্রদত্ত গ্রামের পূর্ব্বে গৌড় বিশেষণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

কুমারাধিরাজ সোমেশ্বরদেবের শোণপুর-শাসন,—সাবথি (শ্রাবস্তী) মণ্ডলান্তর্গত মহুবালিগ্রামবিনির্গত ভট্টপুত্র উদয়কর শর্ম্মাকে প্রদত্ত[১৭]।

প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপালের ৯৫৫ সম্বতে প্রদত্ত দিঘোয়া-দুবৌলি শাসন,—শ্রাবস্তী-ভুক্তিতে শ্রাবস্তীমণ্ডলান্তঃপাতি বালয়িকবিষয়সম্বন্ধ পানীয়ক গ্রাম সাবর্ণগোত্রীয় কৌথুমশাখী ছান্দোগব্রহ্মচারী পদ্মসারকে প্রদত্ত[১৮]।

কীর্ত্তিপালের লক্ষ্ণৌমিউজিয়াম-শাসন,—শ্রাবস্তীবিষয়ান্তঃপাতি ডবিরামগ্রামকুলোৎপন্ন, গৌতমগোত্রীয় পণ্ডিত শ্রীকেশবের পৌত্র, পণ্ডিত শ্রীবিশ্বরূপের পুত্র, ঠক্কুর শ্রীপ্রহসিতশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত[১৯]।

কান্যকুব্জের মহারাজপুত্র গোবিন্দচন্দ্রদেবের ১১৬২ সম্বতে (১১০৫ খৃঃ অঃ) প্রদত্ত শাসন,—সাবিথদেশবিনির্গত বাজসনেয়শাখী বংধুল গোত্র বধুল অঘমর্ষণ বিশ্বামিত্র ত্রিপ্রবর দীক্ষিত নাগানদ (ন্দ?) পৌত্র, দীক্ষিত পুরবাসপুত্র যজুর্বেদবিষ্যানলিনীবিকাসনপ্রত্যক্ষ-ভাস্কর দীক্ষিত বীহ্লককে প্রদত্ত[২০]।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন-শাসন,—শ্রাবস্তীভুক্তিতে কুণ্ডধানীবিষয়ান্তঃপাতি সোম-কুণ্ডিকা গ্রাম, সাবর্ণিগোত্র ছন্দোগব্রহ্মচারী ভট্টবাতস্বামী ও বিষ্ণুবৃদ্ধগোত্র বহ্বৃচব্রহ্মচারী শিবদেব স্বামীকে প্রদত্ত[২১]।

১২। History of Orissa, Vol. I, p. 172.
১৩। J. A. S. B., 1916, Vol. XII (N. S.), pp 291-95.
১৪। Arch. Sur. of Mayurabhanja, App. p. 156.
১৫। J. A. S. B., Vol. I (N. S.), pp 16-18.
১৬। E. I., Vol. III, pp. 355-59.
১৭। E. I., Vol., XII, pp. 237-42.
১৮। Ind. Ant., Vol. XV, pp. 112—113.
১৯। E. I. Vol. VII, p. 96.
২০। E. I., Vol. II, p. 360.
২১। E. I., Vol. VII, p. 157.

উপরোল্লিখিত লিপিসমূহে আমরা কোলাঞ্চ ভিন্ন শ্রাবস্তীর অন্তর্গত আরও কতকগুলি গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি। এখন দেখা যাউক, বঙ্গদেশে এই সব গ্রামের সন্ধান মিলে কি না।

ক্রোড়ঞ্চি, ক্রোড়াঞ্জ ও কোলাঞ্চ—এই তিনটিই যে এক গ্রাম, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বগুড়া জেলার পোলাদশী পরগণায় পাঁচবিবি থানার অন্তর্গত 'কুলাচ' নামে একটি গ্রাম আছে[২২]। কোলাঞ্চই সম্ভবতঃ কুলাচে[২৩] পরিণত হইয়াছে। মানচিত্রে 'Koolarch' লিখিত আছে। সেটেলমেণ্ট আফিসে যে নূতন গ্রামের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ইহা 'কুলচর্য্য' নাম ধারণ করিয়াছে। সম্ভবতঃ অর্দ্ধযুক্ত শুদ্ধ ভাষায় 'কুলাচ' কুলচর্য্যে পরিণত হইয়াছে। কুলচর্য্য অর্থাৎ পূজনীয়কুল। এই পরিবর্ত্তনের মূলেও কোন প্রকার প্রবাদ আছে কি না, তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। কোলাঞ্চ প্রধানতঃ শাণ্ডিল্য গোত্রের কুলস্থান।

তর্কারি—ইহার অবস্থান সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সিলিমপুর-প্রশস্তি-লিখিত ইহার নিকটস্থ অন্য দুইটি গ্রামের (বালগ্রাম ও সিয়াম্বর) যখন সন্ধান মিলিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তর্কারি সিলিমপুরের নিকটেই কোন স্থানে ছিল। বগুড়া জেলার থানা আদমদীঘী, ডাকঘর সুলতানপুরের অন্তর্গত 'টিকারি' নামে একটি গ্রাম আছে, কিন্তু তাহা পৃথক্ গ্রাম বলিয়াই মনে হয়। তর্কারি প্রধানতঃ ভরদ্বাজ গোত্রের কুলস্থান।

বৈগ্রাম—দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানায় বৈগ্রাম নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা হিলি রেলওয়ে ষ্টেশনের খুব সন্নিকট। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় ম্যাপে Koolarch ও Baigram-এর অবস্থান আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি যে হিলির নিকটে গুপ্তকালের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই বৈগ্রাম হইতে। আমাদের মনে হয়, দামোদরপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনপঞ্চকের তৃতীয়সংখ্যক শাসনখানিতে যে বায়ীগ্রামের উল্লেখ আছে, তাহা ও এই বৈগ্রাম অভিন্ন।

কাশিলি ও কাশিল্লি—এই উভয়ই এক গ্রাম বলিয়া মনে হয়। বগুড়া জেলার পাঁচবিবি থানায় কুশইল (Kushaila) নামে একটি গ্রাম আছে।

২২। বগুড়ার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৩০ পৃষ্ঠা।

২৩। আমরা এই কুলাচ গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার জন্ম বগুড়ার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি জানাইয়াছেন যে, এই গ্রামকে সাধারণ লোকে 'কুলোচ' বলে। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামে মুসলমানের বাস। তবে এখানে 'কালীর থান' আছে। ঐ গ্রামে প্রাচীন চিহ্ন বিশেষ কিছুই নাই। পার্শ্ববর্ত্তী বায়ারী গ্রামে প্রাচীন দীঘী ও ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। যাহা হউক, কুলোচে যে হিন্দুর বাসস্থান ছিল, তাহার সাক্ষী 'কালীর থান'। যাহা হউক, কুলোচে বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীনত্বের কোন নিদর্শন না পাইলেই যে ইহাকে আধুনিক স্থান মনে করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। শুনিতে পাই, বর্ত্তমান সিলিমপুর গ্রামে প্রাচীন প্রস্তরলিপি এবং প্রস্তরনির্ম্মিত বরাহমূর্ত্তি পাওয়া গেলেও ঐ স্থান দেখিয়া উহাকে প্রাচীন গ্রাম বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন স্তূপ ইত্যাদি কৃষকগণ সমভূমিতে পরিণত করিয়া তাহার চাষ করিতেছে।

মহুবালি গ্রাম—বগুড়া জেলার খেতলাল থানায় মোয়াইল নামে একটি গ্রাম আছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কাশ্যপ গোত্রের মোয়ালি গাঞি সম্ভবতঃ এই মহুবালি গ্রাম হইতে উৎপন্ন। * কোন কোন পুথিতে মৌহালী নামও পাওয়া যায়।

বালগ্রাম—সিলিমপুর প্রশস্তিতে বালগ্রামের উল্লেখ আছে। সিলিমপুরের নিকট খেতলাল থানায় বলিগ্রাম (ম্যাপে Belgaon) নামে একটি গ্রাম আছে। আমরা অন্যত্র এই বলিগ্রাম বা বেলগাঁও এবং বালগ্রাম অভিন্ন বলিয়াছি[২৪]।

শিয়ম্বগ্রাম—সিলিমপুর প্রশস্তিতে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। শিম্ব বা শিম্বি ভরদ্বাজগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের একটি গাঞি। সিলিমপুরলিপি ভরদ্বাজগোত্রীয় প্রহাস নামক এক ব্রাহ্মণের কুলপ্রশস্তি। এই প্রহাসের বাড়ী ছিল শিয়ম্ব গ্রামে। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি, বর্ত্তমান সিলিমপুরই প্রাচীন শিয়ম্ব এবং এই স্থান হইতেই শিম্ব গাঞির উৎপত্তি[২৫]।

কুটুম্বপল্লী—উক্ত সিলিমপুর প্রশস্তিতে এই গ্রামেরও উল্লেখ আছে। কুড়ুম্ব বা কুড়মুড়ি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বাৎস্য গোত্রের একটি গাঁঞি এবং ইহার উৎপত্তি এই কুটুম্ব পল্লী হইতে[২৬]।

বালয়িক বিষয়—রাজসাহী জেলার বাগমারা ও বরইগ্রাম থানায় বালিয়া গ্রাম এবং মান্দা থানায় মালসেরা ডাকঘরের অধীন বালিচ নামে গ্রাম আছে।

পানীয়ক গ্রাম—রাজসাহী জেলার বাগমারা ও সিংরা থানায় পানিয়া গ্রাম এবং মান্দা থানায় মালসেরা ডাকঘরের অধীন পানিয়াল গ্রাম আছে

প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের দিঘোয়া-দুবৌলি শাসনে উপরোক্ত বালয়িকবিষয়ান্তঃ-পাতি পানীয়ক গ্রামে ব্রাহ্মণকে জমি দান করা হইয়াছে। এই শাসনখানি বেহারের সারণ জেলার দিঘোয়া-দুবৌলি গ্রামে এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে প্রাপ্ত। আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজসাহী জেলার চারঘাট, নগাঁও ও পাঁচপুর থানায়, Atrai ডাকঘরের অধীন দীঘা গ্রাম, আবার ঐ পাঁচপুর থানায় ঐ ডাকঘরের অধীন এবং মান্দা থানায় মালসেরা ডাকঘরের অধীন দুবৈল নামে গ্রাম আছে। সম্ভবতঃ এই দুই গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণগণ গিয়া সারণ জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং দিঘোয়া-দুবৌলি গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ মহেন্দ্র পালের নিকট হইতে পানীয়ক গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন।

ডবিরামকুল—বগুড়া জেলার আদমদীঘী থানায় Darakul নামে একটি গ্রাম আছে। কীর্ত্তিপালের শাসনোক্ত এই ডবিরামকুল গ্রামোৎপন্ন ব্রাহ্মণের নাম ঠক্কুর প্রহসিতশর্ম্মা। বগুড়া খেতলাল থানার মাথরাই বা মাত্রাই গ্রামে প্রহসিতশর্ম্মা নামাঙ্কিত একটি ভগ্ন স্তম্ভলিপি পাওয়া গিয়াছে[২৭]।

কুণ্ডধানী বিষয়—ইহার অবস্থান সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

২৪। I. A., Vol. LX, p. 3, n. 4.

২৫। I. A., Vol. LX, p. 3.

২৬। Ibid.

২৭। বগুড়ার ইতিহাস, ২য় সংস্করণ।

সোমকুণ্ডিকা—রাজসাহী জেলার বোয়ালিয়া থানায় সোমইকুণ্ডি (Shomai-kundi)[২৮] নামে একটি গ্রাম আছে। আমাদের স্থান নির্দ্দেশ ঠিক হইলে প্রমাণ হয় যে, হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য ৬৩১ খৃষ্টাব্দে গৌড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, সম্ভবতঃ ৬৩১ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্য হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুর তাম্রশাসন কর্ণস্বুবর্ণ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল[২৯]। কেহ কেহ ইহা হইতে অনুমান করিয়াছেন যে, শশাঙ্কের গৌড়রাজ্য হর্ষের জীবিতকালেই ভাস্কর-বর্ম্মার হস্তগত হইয়াছিল। আমরা কয়েকটি কারণে এই মত গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। শশাঙ্ক ছিলেন হর্ষের ভ্রাতৃহন্তা ও প্রবলপরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। যে রাজ্যবলে বলীয়ান্ হইয়া শশাঙ্ক ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতি হইবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, হর্ষ বহু কষ্টে সেই রাজ্য জয় করিয়া তাঁহার মিত্ররাজ ভাস্করবর্ম্মাকে ছাড়িয়া দিবেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাকে নিজ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পরিণত করিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। হর্ষের ন্যায় রাজনীতি-বিশারদের এইরূপ একটা প্রকাণ্ড ভুল করা সম্ভবপর নহে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া হর্ষ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি পৃথিবী নির্গৌড় করিবেন[৩০]। তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালনকল্পে কি করিয়াছিলেন, তাহা কেহই বলেন নাই। তিনি যে ইহা বৃথা গর্ব্বোক্তিতে পর্য্যবসিত হইতে দিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গৌড় জয় দ্বারা "পৃথিবী নির্গৌড" হয় না। সম্ভবতঃ তিনি গৌড় জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ইহার গৌড় নাম লোপ করিয়া, অন্য কোন নামকরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি গৌড়রাজ্যকে তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বসীমান্তস্থিত শ্রাবস্তীভুক্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া গৌড় নাম লোপ করিয়াছিলেন। হর্ষের বাঁশখেরা শাসন বর্দ্ধমানকোটি হইতে প্রদত্ত[৩১]। এই বর্দ্ধমানকোটির অবস্থান কেহ নির্ণয় করেন নাই। রঙ্গপুর জেলায় বর্দ্ধনকোটি নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই উভয় স্থান এক হইতে পারে। (সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে বঙ্গের শ্রাবস্তীর উল্লেখ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই) হর্ষ যে শশাঙ্কের রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, তিনি ৬৪১ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাটের নিকট যে বার্ত্তা প্রেরণ করেন, তাহাতে তিনি নিজকে মগধেশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন[৩২]। মগধ যে শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবসর নাই। রোটাসগড়ে প্রাপ্ত শশাঙ্কদেবের নামাঙ্কিত শীল[৩৩] এবং বুদ্ধগয়ায় তাঁহার অবাধ অত্যাচারই ইহা সপ্রমাণ করিতেছে[৩৪]।

২৮। আমরা রাজসাহী গিয়া সোমাইকুণ্ডি গ্রাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। ঐ জেলায় 'কুণ্ডি' বা কুঁড়ি নামান্ত কয়েকটি গ্রাম থাকিলেও সোমাইকুণ্ডি গ্রামের সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে সহরের নিকটে সোনাইকান্দি নামে গ্রাম আছে।

২৯। E. I., Vol. XII, pp. 65 ff.

৩০। হর্ষচরিত, ৭ম উচ্ছ্বাস।

৩১। E. I., Vol. IV, p. 211.

৩২। Watters, Vol. I, p. 351.

৩৩। C. I. I., Vol. III, p. 284.

৩৪। Watters, Vol. II, p. 115.

আমাদের উপরি উক্ত অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে কোলাঞ্চ কান্যকুব্জরাজ্যের তথা শ্রাবস্তীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণগণের কান্যকুব্জ হইতে আগমনের ভিত্তি বোধ হয় এইখানে। পালরাজগণ পুনরায় গৌড় নাম প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের দিঘোয়া-দুবৌলি তাম্রশাসনে আবার শ্রাবস্তীভুক্তি ও শ্রাবস্তীমণ্ডলের উল্লেখ পাইতেছি এবং এই শ্রাবস্তীমণ্ডলস্থ পানীয়ক গ্রামের সন্ধানও গৌড়মণ্ডলেই পাইতেছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহেন্দ্রপালের পুত্র বিনায়কপালের ৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত শাসনোল্লিখিত স্থানগুলিও গৌড়মণ্ডলেই পাওয়া যাইতেছে। এই শাসন দ্বারা প্রতিষ্ঠানভুক্ত্যন্তঃপাতি বারাণসী-বিষয়সম্বন্ধ-কাশীপার-পথক-প্রতিবদ্ধ টিক্করিকা গ্রাম দান করা হইয়াছে। এই তাম্রশাসনখানি Bengal Asiatic Society's Plate নামে পরিচিত। কিন্তু ইহা কোথা হইতে পাওয়া গিয়াছে, জানা যায় না। ফ্লিট সাহেব এই টিক্করিকা ও কাশীর চারি মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান টিক্রি গ্রাম একই মনে করেন[৩৫]। আমরা কিন্তু বগুড়া জেলার পাঁচবিবি থানায় বারানসী, এবং ঐ জেলার আদমদীঘী থানায় সুলতানপুর ডাকঘরের অধীন কাশীপাড়া (Kashipara) ও *টিকারী গ্রাম পাইতেছি। আমাদের এই অবস্থান নির্দ্দেশ যদি ঠিক হয়,* তবে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগেও গৌড় প্রতীহারসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমরা উপরে ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় যতগুলি শ্রাবস্তী পাইয়াছি, তাহার কোনটি ভুক্তি, কোনটি মণ্ডল, কোনটি বিষয়, কোনটী দেশ এবং কোনটি শুধু শ্রাবস্তী। স্পষ্টভাবে শ্রাবস্তী নামে কোন নগরীর উল্লেখ পাইতেছি না। শুধু শ্রাবস্তা, জনপদ কিম্বা নগরী, এই উভয়ের কোন একটি হইতে পারে। এই ব্রাহ্মণ-শ্রাবস্তী যে বঙ্গদেশে অবস্থিত ছিল, তাহা বালগ্রাম (বলিগ্রাম), শিয়ম্ব (শিলিমপুর), মহুবালি (মোয়াইল), বৈগ্রাম, কোলাঞ্চ (কুলাচ বা কালঞ্জ) গ্রামগুলির অবস্থান দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই শ্রাবস্তী একটি জনপদ, যাহা বর্ত্তমান দিনাজপুর ও বগুড়া জেলা ব্যাপিয়া ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কূর্ম্মপুরাণে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে,—শ্রাবস্তি, গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নামে 'মহাপুরী' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যথা,—

"তস্য পুত্রোঽভবদ্বীরঃ শ্রাবস্তিরিতি বিশ্রুতঃ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে মহাপুরী॥"

আজ পর্য্যন্ত আমরা উত্তরবঙ্গে শ্রাবস্তী কিম্বা ইহার সদৃশ নামযুক্ত কোন স্থানের সন্ধান করিতে পারি নাই। অন্য পক্ষে মধ্যদেশের শ্রাবস্তী নগরী বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ঐ দেশে শ্রাবস্তী নামে কোন প্রদেশের উল্লেখ পাইতেছি না। সুতরাং পুরাণোল্লিখিত গৌড়দেশ মধ্যদেশেই ছিল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে শ্রাবস্তী নামে নগরীর সন্ধান মিলিতেছে না বলিয়াই যে উহা কোন কালে ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় সমীচীন হইবে না। সিলিমপুর লিপিতে লিখিত আছে যে, শ্রাবস্তী-প্রতিবদ্ধ তর্কারি ও বালগ্রামের মধ্যে শকটিগ্রাম অবস্থিত ছিল এবং ইহার নিকটেই শিয়ম্বগ্রাম ছিল। আরও লিখিত হইয়াছে যে, বালগ্রাম বরেন্দ্রে ছিল। আমরা জানি যে, শকটি,

৩৫। Ind. Ant., Vol. XV, pp. 138 ff.

বালগ্রাম ও শিয়ম্ব, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ভরদ্বাজ গোত্রীয়দিগের গাঞি নাম। সুতরাং ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐ গ্রামগুলি বরেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বালগ্রাম ও শিয়ম্বের সন্ধান মিলিলেও তর্কারি কিম্বা শকটির কোন সন্ধান পাইতেছি না। এই প্রমাণে কি আমরা বলিতে পারি যে, তর্কারি এবং শকটি নামে কোন গ্রাম বরেন্দ্রে ছিল না? শকটি ও বালগ্রাম যখন বরেন্দ্রদেশের অন্তর্গত, তখন ইহার অতীব সন্নিকটস্থ গ্রাম তর্কারি যে অন্য একটি বিভিন্ন প্রদেশের অর্থাৎ শ্রাবস্তী দেশের অন্তর্গত ছিল, এরূপ মনে করা বোধ হয় সমীচান হইবে না। 'শ্রাবস্তী-প্রতিবদ্ধ তর্কারি' বলিতে বোধ হয়, 'শ্রাবস্তী-নগরী-প্রতিবদ্ধ' মনে করাই যুক্তিসিদ্ধ হইবে। সুতরাং এই শ্রাবস্তী নগরী বগুড়া জেলায় সিলিমপুরের নিকটেই ছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী কালে হয় ত ইহার নামের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে।

কোলাঞ্চ কিরূপে পরবর্ত্তী কালে কান্যকুব্জে পরিণত হইল, ইহার কোন সন্তোষজনক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা উপরে একটি অনুমান করিয়াছি; কিন্তু তাহা খুব সন্তোষজনক নহে। এখানে আমরা আর একটি অনুমানের কথা উল্লেখ করিতেছি। আসামের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কামতারাজ দুর্লভনারায়ণের নিমন্ত্রণে গৌড়ের কনৌজ নগর[৩৬] হইতে সপ্ত ব্রাহ্মণ এবং সপ্ত কায়স্থ কামতার রাজধানী কামতাপুরে গমন করেন। এই কায়স্থগণই আসামের আদি বার-ভুঁইয়া বংশের মূল। এই কামতা রাজ্য কামরূপের পশ্চিমে করতোয়া হইতে বরনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল[৩৭]। বর্ত্তমান রঙ্গপুর এবং কোচবিহারই এই কামতা রাজ্য। কামতাপুরের ধ্বংসাবশেষ কোচবিহার রাজ্যের দিনহাটা মহকুমায় বর্ত্তমান। আমাদের মনে হয়, একাদশ শতাব্দীর পরে এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে শ্রাবস্তী দেশ কনৌজ এবং শ্রাবস্তী নগরী কনৌজ নগর নাম ধারণ করিয়াছিল। এই জন্যই কোলাঞ্চাগত ব্রাহ্মণগণ পরবর্ত্তী কালে কনৌজাগত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

এই কনৌজ নগর হইতে যখন আসামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গমনের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন এই কনৌজরাজ্য হইতে গৌড়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গমনের প্রবাদ অসম্ভব মনে হয় না। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে কনৌজ ও গৌড় দুইটি ক্ষুদ্র ও ভিন্ন রাজ্য ছিল, তাই কোলাঞ্চ হইতে গৌড়ে গমনের কথা কুলজী গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কনৌজ নগর গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে।

আমরা ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বিভিন্ন প্রদেশে ব্রাহ্মণ গমনের কথা প্রাচীন লিপিতে দেখিতে পাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ গমনের কথা কোন প্রাচীন লিপিতে আমাদের চক্ষে পড়ে নাই।

৩৬। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজসাহী জেলার নওগাঁ থানায় কনৌজ এবং চারঘাট থানায় তর্কারি নামক গ্রাম পাইতেছি (Village Directory of Rajshahi District)।

৩৭। Social History of Kamarupa, Vol. II, Chap. I, pp. 2-4 & 9-10.

দেখা যাইতেছে যে, গৌড় রাজ্যে গৌড়, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, বারাণসী, কনৌজ ইত্যাদি নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং নগর এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং এই সব নাম পাইলেই ইহাদের সন্ধান করিতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাওয়ার কোন দরকার দেখা যায় না। গৌড়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কোন সময়ে অভাব হইয়াছিল মনে হয় না। দেশে যখন বৌদ্ধ পালরাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, তখনও দেখা যায় যে, এই শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বৈদিকাচারী ছিলেন। নবম শতাব্দী হইতে বহু ব্রাহ্মণ যে, এই গৌড় হইতে অন্য প্রদেশে সসম্মানে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণ এই গৌড়মণ্ডলেরই অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারা অন্য দেশ হইতে আসেন নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

কবি সৈয়দ সোলতান*

ভূমিকা

বঙ্গ-সারস্বত-কুঞ্জে কবি সৈয়দ সোলতানের স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয় করিবার সময় এখনও আসে নাই। কারণ, বাঙ্গালার এই প্রাচীন মুসলমান কবি সম্বন্ধে অদ্যাবধি কোন ঐতিহাসিক বা সমালোচনামূলক আলোচনা হয় নাই। তবে যে দিক্ হইতে বিচার করা যাউক না কেন, তিনি যে বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। মহাভারত-প্রণেতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর, সঞ্জয়, কাশীদাস এবং রামায়ণ-প্রণেতা কৃত্তিবাস প্রভৃতির সহিত ইঁহার তুলনা করা যাইতে পারে। সময় হিসাবে তিনি কবীন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। সঞ্জয়, কাশীদাস ও কৃত্তিবাস সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণের কথা বাঙ্গালায় বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছিলেন; আর সৈয়দ সোলতান আরবী "কসসুল্ আম্বিয়া" বা "নবী-কাহিনী" বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন। সৈয়দ সোলতানকে যে সকল কবির পর্য্যায়ভুক্ত করা হইতেছে, তিনি কবিত্বে বা পাণ্ডিত্যে তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না, বরং কোন কোন অংশে তিনি তাঁহার সহযোগিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ফলতঃ, "সৈয়দ সোলতানের ন্যায় সুলেখক ও এত অধিক গ্রন্থপ্রণেতা কবি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল"[১]।

কবির গ্রন্থাবলীর পরিচয়

এই কবির যে সকল গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে "নবী-বংশ", "শবে মেয়েরাজ", "হজরত মোহাম্মদ-চরিত", "ওফাত-রসুল", "ইব্লিসের কিচ্ছা", "জ্ঞান-চৌতিশা", "জ্ঞানপ্রদীপ", এই কয়টি নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তক কয়খানির অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিপি চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জনাব মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সাহেবের বাড়ীতে রক্ষিত আছে। আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইতেছি, উপরিলিখিত পুস্তকগুলি "নবীবংশ", "শবে মেয়েরাজ" ও "জ্ঞানপ্রদীপ" নামক তিনখানি মূল পুস্তকেরই অংশ মাত্র; মহাভারত ও রামায়ণের ন্যায় "নবীবংশ" একখানি বিরাট্ গ্রন্থ; ইহা আদ্যন্ত পাঠ করিবার মত ধৈর্য্য রক্ষা করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব। ইহার সুদীর্ঘ প্রথম অধ্যায়ে "সৃষ্টিপত্তন" অর্থাৎ আদি সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে; অবশিষ্ট দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্বাদশ জন নবী বা পয়গম্বরের (Prophet) কাহিনী আলোচিত হইয়াছে। "ইব্লিসের কিচ্ছা" "নবীবংশের"ই একটি অধ্যায় মাত্র। "হজরত মোহাম্মদচরিত", "ওফাত রসুল" ও "শবে মেয়েরাজ" একই গ্রন্থ; এই বিরাট্ গ্রন্থের কবি-প্রদত্ত নাম "শবে মেয়েরাজ"। পুথিখানির অনুলিখকগণ

---

* ১৩৪১।২০এ আশ্বিন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। চট্টগ্রাম জিলা সাহিত্য-সম্মিলনী, রাউজান অধিবেশন, ১১৩৩, সভাপতির অভিভাষণ, পৃঃ ৯—১০।

এই সকল নামকরণ করিয়াছেন মাত্র। এই পুস্তকে হজরত মোহাম্মদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক কাহিনী বর্ণিত আছে। "জ্ঞান-চৌতিশা" ও "জ্ঞান-প্রদীপ" একই গ্রন্থের দুই নাম মাত্র। ইহা হিন্দু তান্ত্রিক যোগ ও মুসলমানী "তসব্বুফ" বা দরবেশী শাস্ত্রের মিলনমূলক গ্রন্থ।

এখন দেখা যাইতেছে, কবি সৈয়দ সোলতান মোট তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইগুলি "নবীবংশ", "শবে মেয়েরাজ" এবং "জ্ঞানপ্রদীপ"। এই পুস্তক-ত্রয়ের মধ্যে কেবল "শবে মেয়েরাজ" পুস্তকখানির রচনার তারিখ পাওয়া যাইতেছে এবং "শবে মেয়েরাজের" ভূমিকায় "নবীবংশের" নাম করায়[২], উহা যে "শবে মেয়েরাজ" রচনার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। "জ্ঞান-প্রদীপ" কখন্ লিখিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই; তবে তাহার এক স্থানে ভণিতায় দেখিতেছি,—

"ক্ষীণ অতি শিশুমতি ছৈয়দ ছোলতান।
ক্ষীণবুদ্ধি রচিলেক চৌতিশা যে জ্ঞান॥"

"জ্ঞান-প্রদীপের" এই অংশ পাঠে জানিতে পারি যে, চৌতিশা রচনাকালে কবি শিশুমতি ছিলেন। "জ্ঞান-প্রদীপ"খানিকে তাঁহার প্রথম এবং তরুণ বয়সের রচনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এখন আমরা বলিতে পারি, "জ্ঞানপ্রদীপ" কবি সৈয়দ সোলতানের প্রথম রচনা, "নবীবংশ" তাঁহার দ্বিতীয় রচনা, এবং "শবে মেয়েরাজ" তাঁহার শেষ রচনা। "গ্রহ শত রস যোগে অব্দ" অতীত হইতে অর্থাৎ ৯০৬ হিজরী = ১৫০০ খৃষ্টাব্দের শেষে কবি "শবে মেয়েরাজ" রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে দেখা যাইবে, চৈতন্য-দেবের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) ন্যূনাধিক ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে কবি সৈয়দ সোলতান তাঁহার শেষ কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার "জ্ঞান-প্রদীপ" ও "নবীবংশ" খ্রীষ্টীয় ১৫০০ অব্দের পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত হইয়াছিল।

এই কয়েকখানি পুস্তক ব্যতীত সৈয়দ সোলতান জীবনে আরও অনেকগুলি পরমার্থ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। মনে হয়, দীর্ঘ বর্ণনামূলক ও হিতোপদেশপূর্ণ কাব্য রচনার মধ্যে মধ্যে অবসর সময়ে ভাবপ্রবণ সাধক কাব্যোচ্ছাসময় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গানগুলি রচনা করিয়া চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পাইতেন। এই গানগুলির কোন সংগ্রহ তাঁহার জীবনে তিনি করিয়া গিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে সঙ্গীতজ্ঞগণ তাঁহার কোন কোন গান আপনাদের সঙ্গীতসংগ্রহ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কয়েকটি গান আমরা এই প্রবন্ধের শেষে উদ্ধৃত করিব।

২। "জে সবে মোমিন হয় করুণা হৃদএ।
নবীবংশ, মেহেরাজ রাখিতে জুআএ॥
এ দুই পুস্তক যদি পালিবারে পারে।
আল্লার গৌরব হৈব তাহার উপরে॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

কবির সময় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ

কবি সৈয়দ সোলতানকে কেহ কেহ সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন[৩]। ইহা যে একটি সাধারণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমরা তাঁহার যে বিবরণ ও পুস্তক-প্রণয়নের তারিখ লাভ করিয়াছি, তদ্দ্বারা এই কবির সময় সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইবে। এই বিবরণ[৪] হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, সৈয়দ সোলতান চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুরে সৈয়দবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগই তাঁহার আবির্ভাবকাল; কেন না, তিনি "গ্রহ শত রস অব্দে" অর্থাৎ ৯০৬ হিজরীতে বা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার "শবে মেয়েরাজ" নামক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি পরাগল খান ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সমসাময়িক ছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সহিত পরাগল খাঁর যে সম্বন্ধ ছিল, কবি সৈয়দ সোলতানের সহিত পরাগল খাঁর ঐরূপ কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, সঠিকভাবে বলিতে পারা না গেলেও, "শবে মেয়েরাজ" রচনার কথা বলিতে গিয়া যখন কবির "প্রকাশ্যে সকল কথা মনে নাহি ভায়", তখন তাঁহার সহিতও পরাগল খানের ঐরূপ কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহা কে বলিবে?

৩। চট্টগ্রাম জিলা সাহিত্য-সম্মিলনী, রাউজান অধিবেশন, ১৯৩৩, সভাপতির অভিভাষ পৃঃ ১০।

৪। "এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুআএ।
প্রকাশ্য সকল কথা মনে নাহি ভাএ ॥
লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারতকথা কহিল বিচারি ॥
হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পরে।
খোদা রছুলের কথা কেহ না সোঙরে ॥
গ্রহ সত রস জোগে অব্দ গোঙাইল।
দেশী ভাসে এই কথা কেহ না কহিল ॥
আরবী ফার্ছি ভাসে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে না বুঝে মুর্খ সুত ॥
দুক্ষ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রছুলের কথা জত কহিমু অধিক ॥
লস্করের পুরখানি আলিম বসতি।
মুঞি মুর্খ আছি এক সৈয়দসন্ততি ॥
আলিমান পদে আমি মাগি পরিহার।
খেমিবা পাইলে দোস না করি গোহার ॥
সৈয়দ ছোলতানে কহে কেনে ভাবিঁ মর।
সহায় রছুল জার তরিবে সাগর ॥"—শবে মেয়েরাজ।

আমাদের অনুমান সত্য কি না, জানি না; তবে মনে হয়, এরূপ কোন সম্বন্ধ ছিল; সৈয়দ সোলতান কোন বিশেষ কারণে (যাহা তিনি প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন) তাহা প্রকাশ করেন নাই। কবি তাঁহার "শবে মেয়েরাজ" পুস্তক প্রণয়নে প্রাচীন বঙ্গ-ভারতীর পৃষ্ঠপোষক পরাগল খাঁর আদেশ প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করুন বা না করুন, তাঁহার কাব্য প্রণয়নের মূলে পরাগলী প্রভাব সুস্পষ্ট। কবি নিজেই বলিতেছেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারত রচনা করিলে পর, তাহা হিন্দু-মুসলমান সকলেই ঘরে ঘরে পাঠ করিতে থাকেন; কিন্তু খোদা ও রসুলের কথা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত না থাকায়, মুসলমানগণ তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে কিছুই জানিত না, সে জন্য তিনি দুঃখিত হইয়াই, স্বজাতীয় মুসলমানদিগকে ধর্ম্মের কাহিনী শুনাইতেই "শবে মেয়েরাজ" প্রকাশ করিলেন।

কবির পাণ্ডিত্য

যদিও "লস্করের পুর(=পরাগলপুর)খানি আলিম বসতি। মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দসন্ততি" বলিয়া, কবি বিনয় প্রকাশ করিয়া নিজেকে মূর্খ এবং তাঁহার গ্রামবাসী সকলকে "আলিম" বা বিদ্বান্ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি তিনিও যে তাঁহার গ্রামবাসী বিদ্বান্‌দের চেয়ে কোন অংশে কম বিদ্বান্ ছিলেন, তেমন মনে হয় না। আরবী ও ফার্সী ভাষায় তিনি যে "আলিম" ছিলেন, তাহা এই দুই ভাষা হইতে সংগৃহীত তাঁহার ঐস্লামিক কাহিনীপূর্ণ পুস্তকাবলী দৃষ্টে জানিতে পারিতেছি। "শবে মেয়েরাজ" পুস্তকের শেষে তিনি ধর্ম্মের কথা বাঙ্গালায় প্রকাশ করিবার জন্য কৈফিয়ৎ প্রদানচ্ছলে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেও জানিতে পারি যে, তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ "আলিম" ছিলেন[৫]। বিদ্বান্ হইয়া মূর্খদিগকে ধর্ম্মের কথা শুনান তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; তাই তিনি বাঙ্গালী মুসলমানকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—

"বঙ্গদেশে যথেক আছএ মুছলমান।
মোহোর বচন সবে কর অবধান ॥

৫। "দেশেত আলিম থাকি যদি ন জানাএ।
সে আলিম নরকেত যাইব সর্ব্বথাএ ॥
নর সবে পাপ কৈলে আলিমেরে ধরি।
আল্লার সাক্ষাতে মারিবেন্ত দণ্ড বাড়ি ॥
তোহ্মারা সবের মেলে মোর উতপন।
তে কারণে কহি আহ্মি শাস্ত্রের বচন ॥
আল্লায় বুলিব তোহ্মা আলিম আছিলা।
মনুষ্যে করিতে পাপ নিষেধ না কৈলা ॥
আছুক আপনা পাপ আলিমে খণ্ডাইব।
পরের পাপের লাগি লাঘব পাইব ॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

"পুণ্যকার্য্যে তুহ্মি সভানের হউক মন।
তোহ্মারে সন্তোষ হউক প্রভু নিরঞ্জন ॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

এইরূপে তিনি বঙ্গভাষার মধ্যস্থতায় বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথমেই ধর্ম্মের কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। হয় ত তাঁহার গ্রামবাসী আলিমগণ দেশীয় ভাষার এক বর্ণ জানিতেন না। কিন্তু আমাদের কবি খ্রীষ্টীয় ১৫০০ অব্দে বাঙ্গালা ভাষায় যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

সঙ্গীত ও কাব্যে কবির অধিকার

সৈয়দ সোলতান প্রাচীন কাব্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার কাব্যাবলীর মধ্যে পয়ার, যমক, একাবলী, দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ এবং নানাবিধ অলঙ্কারের অজস্র ও সুষ্ঠু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; বিশেষতঃ তিনি পাকা ওস্তাদের ন্যায় তাঁহার কাব্যের প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শিরোদেশে ছন্দের নামের সহিত সঙ্গীতজ্ঞদের জন্য শ্রী, গান্ধার, মল্লার, তুরি, বসন্ত, ভাটিয়াল, গুজরী, বরারি, সিন্ধুরা, দেশবারি, পঞ্চম, ধানশী, কানেড়া, কেদার প্রভৃতি অনেক রাগ-রাগিণীর নাম উল্লেখ করিতেও ভুলেন নাই। তাঁহার পরমার্থ-সঙ্গীত রচনার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

কবি সৈয়দ সোলতান একজন পীর ছিলেন; তিনি শাহা হাসন নামক কোন সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার ভণিতায় অনেক স্থলে এই সাধকের নাম সসম্মানে উল্লিখিত হইয়াছে। কবির অনেক শিষ্য ছিল বলিয়া জানা যায়; তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও সেবা শুশ্রূষা করিত; তিনি তাহাদিগকে এ কাজ হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন[৬]।

কবির সময়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি মুসলমানদের মনোভাব

কবি সৈয়দ সোলতান যে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার সাধনা করিতেছিলেন, সে সময়ে শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের অবস্থা শোচনীয় ছিল। আরবী ও ফারসী ভাষাভিজ্ঞ "আলিম"গণ বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন না; তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুধর্ম্মের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রন্থাদিকে বা ধর্ম্মের কথাকে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করা ধর্ম্মদ্রোহিতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। "আলিম"দের সঙ্গে গোঁড়া মুসলমানগণও এই মত পোষণ করিতেন। বলা বাহুল্য, সংখ্যায় ইঁহারা অধিক ছিলেন না। অধিকাংশ মুসলমান আরবী ফারসী জানিতেন না, তাই তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিতেন। তাঁহারা ভাষায়, ভাবে, আচারে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহারা

৬। "মোর পরিচর্য্যা তোরা কর কি কারণ।
আহ্মার তোহ্মার মধ্যে নাহি ভিন্নাভিন ॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

"প্রস্তাব" বা গল্প গুজবে দিন কাটাইতেন, ইসলাম ধর্ম্মের কথা কিছুই বুঝিতেন না৭; কেহই তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্মের কথা বা কাহিনী শুনাইতেন না। ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া কবি সৈয়দ সোলতান সাধারণ মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় "নবীবংশ" রচনা করিলেন৮। আরবী ও ফারসী পুস্তক হইতে সার সংগ্রহ পূর্ব্বক "নবীবংশ" লিখিত হইল। কিন্তু কবি বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন না; গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী "মুনাফিক" বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল৯। "শবে মেয়েরাজ" রচনাকালে কবি বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্মের কথা প্রকাশ করার জন্য যে দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহাতে যে শুধু তৎকালের গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মানসিক ভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা নহে; তদ্দ্বারা মাতৃভাষার প্রতি আমাদের কবির শ্রদ্ধা এবং তাঁহার মানসিক উদারতা কত গভীর ও ব্যাপক ছিল, তাহাও জানা যায়। যথা,—

"আল্লায় কহিছে মোরে দেশের যে ভাষ। এক ভাসে পয়গম্বর আর ভাষে নর।
সে দেশে সে ভাষে কৈলুম রছুল প্রকাশ॥ না পারিব বুঝিবারে উত্তর পদুত্তর॥

৭। "কর্ম্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উতপন।
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন॥
আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা।
পরস্তাব পাইয়া সব ভুলিআ রহিলা॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

৮। "তোহ্মার সবের মোঞি জান হিতকারি।
ইমা ইছলামের কথা দিলাম প্রচারি॥
যেরূপে সৃজন হৈল সুরাসুরগণ।
যেরূপে সৃজন হৈল এ তিন ভুবন॥
যেরূপে আদম হাওয়া সৃজন হইল।
যেরূপে যথেক পয়গম্বর উপজিল॥
বঙ্গেত এ সব কথা কেহ না জানিল।
নবীবংশ পাঁচালীত সকলে শুনিল॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

৯। "যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে।
পঞ্চালী রচিলুম করি আছএ দোষিতে॥
মোনাফেক বলে মোরে কিতাবেতু পড়ি।
কিতাবের কথা দিলুম হিন্দুয়ানী করি॥

... ...

এত ভাবি নবীবংশ পাঁচালী রচিলুম।
আল্লা এক মনে ভাবি প্রচার করিলুম॥
তে কারণে কত কত পশুবুদ্ধি নরে।
কিতাব ভাজিলুম করি দোষএ আন্ধারে॥"—(শবে মেয়েরাজ)।

যথেক রছুল নবী পয়গম্বর হৈছে।
উম্মতের যে ভাষা সে ভাষে স্থজিয়াছে ॥

... ...

আরবেত আরবী ভাষে পয়গম্বর।
কহিলা দীনের কথা সবার গোচর ॥
আরবে আরবী ভাষে পাইলা ইমান।
কোরানের কথা শুনি হৈলা মুছলমান ॥

... ...

আরবীর যত কথা খোবাছানী ভাষে
খোরাছানী জিজ্ঞাসয় আববের পাশে ॥
ফার্ছি ভাষে কোরানেব বাখান জানিলা।
যত খোরাছানী তবে ইমান আনিলা ॥
জাওয়া (যাভা) সবে জাওয়া ভাষে আরবী বচন।
কিতাবেব কথা সবে কৈলা উদ্ধারণ ॥
ইমা ইসলামের কথা ভালমতে জানি।
এক করতাব হেন লইলা পরমানি ॥
চোলিআ সকল যত চোলিআ কথাএ।
কোরানের কথা যত বাখানে সদাএ ॥
রুমী সবে রুমী ভাষে কোরানের কথা।
লিখি লই জানিলেন্ত জথেক ব্যবস্থা ॥
তবে তুর্কস্থানী তুর্ক ভাষে আপনার।
কোরানে জে কহিআছে লিখি লৈল সার ॥
শামী সবে শামী ভাষে কোরানের মর্ম্ম।
শুনিয়া করিতে আছে মুছলমানী কর্ম্ম ॥
এমরানীএ এমরান ভাষে কোরানের তত্ত্ব।
শুনি ইমা ইছলাম হইলা সমর্থ ॥
এরাকীএ তার ভাষে ইমা ইছলাম।
মুছলমানী কর্ম্ম সবে করে অনুপাম ॥
পাঠান সকলে পোস্ত ভাষে আপনার।
কোরানের কথা শুনি বুঝিল আচার ॥
কত দেশে কত ভাষে কোরানের কথা।
দীন মোহাম্মদী বুঝি দেঅন্ত ব্যবস্থা ॥

... ...

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষ তাহার অমূল্য যত ধন ॥
পাপী সবে বোলে ছিদ্রি আল্লার প্রচারি।
ছৈয়দ সোলতানে সব দিল ব্যক্ত করি ॥

আমাদের কবি দেখিয়াছিলেন, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি আপন আপন ভাষায় ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া ইসলাম-বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু হতভাগ্য বাঙ্গালী মুসলমান কেবল গোঁড়া সম্প্রদায়ের গোঁড়ামীর জন্যই আপন ভাষায় তাহাদের ধর্ম্মকথা শুনিতে পারিতেছে না। তাই তিনি এই গোঁড়ামীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালী মুসলমানকে সর্ব্বপ্রথম মাতৃভাষায় ধর্ম্মের কাহিনী শুনাইলেন। ইহাতে গোঁড়া সম্প্রদায় রুষ্ট হইয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, কবি আল্লা ও রসুলের অবমাননা (ছিদ্র) করিয়াছেন। কিন্তু কবি—

"এত শুনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলুম।
আল্লার কেমন ছিদ্রি প্রচার করিলুম ॥
মহিমা সে আল্লার দিলুম প্রচারিআ।
মহিমারে ছিদ্রি বোলে মনে না ভাবিআ ॥
পয়গম্বর সবের মহিমা প্রচারিলুম।
পাপমতি ইব্লিছের অযশ ঘোষিলুম ॥
তবে কেনে ছিদ্রি প্রচারিলুম করি বোলে।
মনে ভাবি না চাহিলা পাপিষ্ঠ সকলে ॥

... ...

মোহোর মনের ভাব জানে করতারে।
জথেক মনের কথা কহিমু কাহারে ॥"

কবি অন্তরের অন্তস্তলে বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি ধর্ম্মের কথা বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়া কোন পাপ করেন নাই। ইহাতে বাঙ্গালী মুসলমানের কল্যাণ হইবে; কবি তাঁহাদের শত্রু নহেন, বরং মিত্র[১০]। তিনি সারা জীবন বঙ্গভাষার সেবায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই ভাষাকে তিনি দেশমাতৃকার পবিত্র ভাষা বলিয়া মনে করিতেন[১১]।

কবির সমাদর

বলা বাহুল্য, কালক্রমে কবির প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধার ভাব দূরীভূত হইয়াছিল, এবং তিনি পরে সমাদরও লাভ করিয়াছিলেন। কবি বড় আশায় বুক বাঁধিয়া বলিয়াছিলেন,--

"বঙ্গদেশে যথেক আছএ মুছলমান।
মোহোর বচন সবে কর অবধান॥"

সত্যই মুসলমানেরা পরে তাঁহার বচন অবধান করিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে আলাওলের "পদ্মাবতী" ব্যতীত, অন্য কোন কবির কাব্য এত সমাদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার কাব্যাবলীর প্রতি লোকানুরাগ কি পরিমাণে ছিল, তৎসম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, হিন্দুর রামায়ণ ও মহাভারতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট কাণ্ড ও পর্ব্ব যেমন সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া কেবল সেই সেই কাণ্ড ও পর্ব্বের পাণ্ডুলিপি নানা স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে, তেমনই তাঁহার সমগ্র কাব্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অংশ বিশেষ বিশেষ নামে চট্টগ্রাম বিভাগের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের সহিত সৈয়দ সোল্তানের তুলনা

সৈয়দ সোলতান একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের উপরে তাঁহার স্থান হইতে পারে কি না, সে বিচার করা কঠিন হইলেও তিনি যে তাঁহাদের সহিত তুলনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস আধুনিক যুগে ছাপাখানার কল্যাণে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছেন সত্য, সৌভাগ্যক্রমে কবি সৈয়দ সোলতানও যদি অন্ততঃ বটতলার সুনজরে পড়িতেন, তবে আজ বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে ঘরে তাঁহার জয় জয়কার পড়িয়া যাইত। আধুনিক দোভাষী বাঙ্গালায় লিখিত কবিত্বলেশহীন "কসসুল আম্বিয়া" বটতলার কল্যাণে আজ ১০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াও বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস যেমন হিন্দুধর্ম্মের কাহিনী সরল পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, সৈয়দ সোলতানও ইসলাম ধর্ম্মের কাহিনী সরল ও সরস পদ্যে বিভিন্ন

১০। "তোহ্মার সবের মোঞি জান হিতকারি।
ইমা ইছলামের কথা দিলাম প্রচারি॥"

১১। "আল্লায় কহিছে মোরে দেশের যে ভাষ।
সে দেশে সে ভাষে কৈলুম রছুল প্রকাশ॥"

ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের ন্যায় বর্ণনামূলক (Narrative) পদ্যে সৈয়দ সোলতানও সিদ্ধহস্ত। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের মত সৈয়দ সোলতানও আরবী "কসসুল আম্বিয়ার" হুবহু অনুবাদ তাঁহার "নবীবংশে" প্রদান করেন নাই। যে দিক্ হইতেই বিচার করা যাক না কেন, সৈয়দ সোলতান কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের সহিত স্থান অধিকার করিতে পারেন, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

কবির ভাষা

সৈয়দ সোলতানের ন্যায় সুলেখক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল। তাঁহার ভাষা সরল, মধুর, সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক। তাঁহার যাবতীয় কাব্যের কোথাও দুই চারিটি পারিভাষিক শব্দ ব্যতীত. কোন আরবী বা ফারসী শব্দ নাই। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী যেমন স্বচ্ছ ও শীতল ধারা বক্ষে করিয়া কুলু কুলু নাদে আপন স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হয়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এই মুসলমান কবির ভাষাও তদ্রূপ আপন মাধুর্য্যে ভরপূর হইয়া স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতে সর্ব্বত্র সুন্দর ভাবে নানা ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা কিরূপ সুন্দর ও স্বাভাবিক, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি কবিতা হইতে প্রতীয়মান হইবে,—

"তপন পিরিতি, মনে ভাবি অতি,
নলিনি বিকাস ভেল।
বিধির ঘটন, না হৈল দর্শন,
কালমেঘে আচ্ছাদিল ॥—(নবীবংশ)।

অন্যত্র,—

সুমেরু গিরির আড়ে গেল দিবাকর।
দিশি যাই নিশি আইল অতি ঘোরতর ॥

আবার,—

"শুনহ পবন তুহ্মি আহ্মার বচন।
কহিঅ সোআমির পদে মোর নিবেদন ॥"

কবি সৈয়দ সোলতান তাঁহার কাব্যের নানা স্থানে অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বিবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দুই একটি নির্দ্দেশ করিলাম। যথা,—

অনুপ্রাস,—

"জনম জন্মেল মোর হইতে জঞ্জাল।
জগতেত জীবন জৌবন হৈল কাল ॥"

উপমা,—

ঢাকিয়া বসনে অঙ্গ, সখিগণ লই সঙ্গ,
বাহিরিলা রাজার কুমারী।
জেন আকাসের সসি, মর্ত্তেত নামিল আসি,
নক্ষত্র সকল সঙ্গে করি ॥"—(নবীবংশ)।

কবিত্ব

কবি সৈয়দ সোলতান যে বিষয় লইয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাহা কবিত্ব প্রদর্শনের পরিপন্থী। ,একে ধর্ম্মের কাহিনী, তাহার উপর আবার ইস্লামীয় ধর্ম্ম; সুতরাং সৈয়দ সোলতানের কবিত্ব দেখাইবার সুযোগ কোথায়? কৃত্তিবাস ও কাশীদাস, কাব্য রচনায় যেরূপ ইচ্ছানুক্রমে নূতন সৃষ্টির ও কল্পনার লীলার অবতারণা করিয়াছেন, সৈয়দ সোলতান ধর্ম্মের এবং স্বজাতীয় গোঁড়াদের ভয়ে, তাহা করিতে পারেন নাই। ইহা সৈয়দ সোলতানের পক্ষে দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয়, সন্দেহ নাই। আরও প্রশংসার বিষয় এই, কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের যে স্বাধীনতা, সৃষ্টি ও কল্পনা দেখাইবার অবসর ছিল, সৈয়দ সোলতান তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াও, সৃষ্টি ও কল্পনার ক্ষেত্রে যে ললাম লীলার কৌশল দেখাইয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাকে কাশীদাস ও কৃত্তিবাসের সমকক্ষ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার "নবীবংশের" যেখানেই তিনি একটু সুযোগ পাইয়াছেন, সেইখানেই কবিত্বের উপবন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টিশক্তির কৌশলে আদম হাওয়াব বিরহ, আকিমার চৌতিশা প্রভৃতি কবিত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডাররূপে বিরাজ করিতেছে। বসন্তে বৃন্দাবন ধামে গোপীবৃন্দকে লইয়া হরি যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া সৈয়দ সোলতান যে অপূর্ব্ব কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐরূপ কবিত্বময় কোন অংশ কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্যেও নাই। মুসলমান কবির পক্ষে বৃন্দাবন-লীলার এমন কবিত্ব-মাধুর্য্যে ভরপূর বর্ণনা কি কম কৃতিত্বের বিষয়? পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে আমরা কবির এই চমৎকার রচনাটুকু এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।—

"রাগ বসন্ত

বসন্ত খেলিতে হরি শ্রদ্ধা হৈল বড়।
লবঙ্গ, গুলাল, জাতি,　　বিকাস আমোদ ভাতি
চম্পা, কেতকী, নাগেশ্বর ॥ ধুআ।
বসন্ত খেলাএ হরি,　　হরসিত মন করি,
নানা রঙ্গ কতুক অপার।
নিকুঞ্জ গহন ঘন,　　হরসিত গোপীগণ,
চান্দ সনে জেহেন চকোর ॥
চুতগণ মুকুলিত,　　নানা পুষ্প বিকসিত,
ভ্রমর ভ্রমএ অনুক্ষণ।
কানন নিকুঞ্জ পাই,　　কুকিল হরিস হই,
কুহু কুহু বোলএ সঘন ॥
পরিআ সুগন্ধি বাস,　　করিআ বিবিধ লাস,
গোপীগণ হরির গোচর।

লইআ ফাগুর ধূলি, অঙ্গে অঙ্গে মেলামেলি,
ঠেলাঠেলি করে নিরন্তর ॥
চন্দন কস্তুরি লই, হরির নিকট জাই,
কেহো নারি কতুকে ফেলাএ।
কেহো পরিহাস করে, কেহো এ বসনেত ধরে,
কেহো নারি আবির খেপএ ॥
কেহো কেহো নারি গিআ, মাধবির মালা লৈআ,
হরির কণ্ঠেত নিআ ধরে।
কেহো বোলে কর জুরি, হরিক প্রণাম করি,
হাঁসিতে হাঁসিতে তুতি করে ॥
কেহো কেহো নারি আসি পসার দেঅন্ত বসি,
কেহো বেচে মুকুতা প্রবাল।
জৌবন মাণিক্য ধন, হরিত বেচিতে মন,
দেখি অতি বণিজ্জার ভাল ॥
কহে চৈদ ছোলতান, না রহিব হরির মান,
পাপেত ডুবিল সবার মন।
লইআ গোপিনিগণ, হাস্ত কেলি রঙ্গ মন,
পাসরিলা প্রভুক সেবন ॥"—(নবীবংশ)।

কবির উপর যুগধর্ম্মের প্রভাব

কবি সৈয়দ সোলতান যে সময়ে (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের যুগ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের সর্ব্বত্র ইস্‌লাম্ ও হিন্দু ধর্ম্মের মিলনের এক বিরাট্ প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। এই সময়ে রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু, চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় উদারহৃদয় হিন্দু মুসলমান সাধকদের আবির্ভাবে ভারতের শাসক ও শাসিতেরা একই প্রকারের চিন্তা-ধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া একই স্থানে আসিয়া মিলিত হইতেছিল। এই যে দুই যুধ্যমান ধর্ম্মের মিলন-প্রচেষ্টা, ইহা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। কবি সৈয়দ সোলতানের কাব্যগুলিতে আমরা এই উদার আন্দোলনের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। বাঙ্গালার কি হিন্দু, কি মুসলমান, আর কোন প্রাচীন কবির মধ্যে সৈয়দ সোলতানের পূর্ব্বে এই প্রচেষ্টা দেখা যায় না। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতা-বিদ্বেষ-পূর্ণ ও ইস্‌লাম্ সংস্কারের যুগে মুসলমানগণ প্রাচীন বাঙ্গালার এই জাতীয় কবিকে কোথায় স্থান দেন বা কখন "কুফরীর" ফতোয়া দিয়া বসেন, জানি না; তবে তিনি যে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন (এবং এখনও করিতেছেন),

সে যুগের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে, তাঁহাকে কোন দোষ দেওয়া চলে না। কবি হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্ম-সমন্বয়সাধনব্যাপারে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কতখানি আন্তরিকতা ছিল, তাহা কে বলিবে ? কারণ, কবি বলিতেছেন,—

"মোহোর মনের ভাব জানে করতারে।
জথেক মনের কথা কহিমু কাহারে॥"

কবির কাব্যে ইস্‌লাম্ ও হিন্দু ধর্ম্মের সমন্বয়

যেরূপই হউক, এ বিষয়ে কবির আন্তরিকতার যে একান্তই অভাব ছিল, এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। কবি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিলেন, সে যুগের ধর্ম্ম উপেক্ষাই বা করেন কিরূপে ? তাই তাঁহার কাব্যগুলিতে ইস্‌লাম্ ও হিন্দু ধর্ম্ম-সমন্বয় সাধন ব্যাপারের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার "জ্ঞান-প্রদীপ"খানি হিন্দুর তান্ত্রিক যোগ ও ইস্‌লামী "তসব্বুফ্" শাস্ত্রের মিলনমূলক গ্রন্থ। কবি স্বয়ং পীর ছিলেন; সুতরাং তিনি এই উভয়বিধ সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সমসাময়িক এক শ্রেণীর মুসলমান পীরদের মধ্যে "তসব্বুফ্" ও তান্ত্রিক যোগের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়; সুতরাং এ প্রচেষ্টা তাঁহার একার নহে। যুগ-ধর্ম্মে তিনি বাধ্য হইয়াই উভয়বিধ সাধন-পদ্ধতির মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার "নবীবংশ" ও "শবে মেয়েরাজ" নামক পুস্তকদ্বয় ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল। এই দুই গ্রন্থও হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। "শবে মেয়েরাজে" হজরত মোহাম্মদের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনায়, হজরতের উপরে অবতারত্ব আরোপ করিতে গিয়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের অনেক কথা হজরতের জন্মে আরোপ করিয়াছেন। হজরতের জন্মে মক্কাবাসীরা আনন্দে হুলুধ্বনি দিয়াছিল, এবং কংস যেমন শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার ষড়্‌যন্ত্র করিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, তদ্রূপ হজরতকেও আবু জেহেল সূতিকাগৃহে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াও দৈব প্রতিকূলতাবশতঃ সক্ষম হয় নাই। "নবীবংশের" প্রথমে যে সৃষ্টিপত্তন অর্থাৎ আদি সৃষ্টির কাল্পনিক ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কবি যেরূপ চমৎকারভাবে হিন্দু মুসলমান পৌরাণিক কাহিনীর (Mythology) সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন, তাহা উভয় শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা না থাকিলে দুইটিকে পৃথক্ করিয়া লওয়া দুষ্কর। উদাহরণস্বরূপ এখানে সপ্ত আকাশ সম্বন্ধে কবির বর্ণনার কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁহার মতে,—

প্রথম	আকাশ	মুক্তায়	নির্ম্মিত	এবং	তাহাতে	শনিগ্রহ	স্থাপিত।
দ্বিতীয়	আকাশ	হিরায়	নির্ম্মিত	এবং	তাহাতে	বৃহস্পতিগ্রহ	স্থাপিত।
তৃতীয়	আকাশ	মাণিক্যে	নির্ম্মিত	এবং	তাহাতে	মঙ্গলগ্রহ	স্থাপিত।
চতুর্থ	আকাশ	সুবর্ণে	নির্ম্মিত	এবং	তাহাতে	রবিগ্রহ	স্থাপিত।
পঞ্চম	আকাশ	এয়াকুতে	নির্ম্মিত	এবং	তাহাতে	বুধগ্রহ	স্থাপিত।

ষষ্ঠ আকাশ রজতে নির্ম্মিত এবং তাহাতে শুক্রগ্রহ স্থাপিত।
সপ্তম আকাশ জমরুদে নির্ম্মিত এবং তাহাতে সোমগ্রহ স্থাপিত।

সপ্ত আকাশের অস্তিত্ব, তাহাদের নির্ম্মাণ ও তাহাতে গ্রহাদির স্থিতির যে পৌরাণিক বর্ণনা গ্রন্থে দেওয়া আছে, তাহাতে হিন্দু জ্যোতিষ, মুসলিম লৌকিক বিশ্বাস এবং তাহাদের মধ্যস্থতায় গ্রীক পৌরাণিক ধারণার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকজাতি সপ্ত আকাশের অস্তিত্বে এবং ধাতু ও মণিমাণিক্য দ্বারা সেগুলি যে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিত; পরে "সারাসিন" বা মুসলমানেরা এই ধারণা গ্রীকদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া কোরাণের "ঈশ্বর সপ্ত আকাশ (=সপ্ত প্রধান গ্রহ) সৃষ্টি করিয়াছেন", এই বাণীর সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লয় এবং কোন্ আকাশ কোন্ ধাতুতে নির্ম্মিত, তাহার কোন্ স্তরে কোন্ প্রকার স্বর্গীয় জীব বাস করে, এবং তাহার কোন্ স্তরে খোদার কল্পিত সিংহাসন "আরশ" স্থাপিত, ইত্যাদি উদ্ভট অনৈসলামিক কল্পনারও আমদানী করেন। বলা বাহুল্য, ইহার সহিত হিন্দু জ্যোতিষের গ্রহস্থিতির মিল ঘটাইয়া কবি একটি অদ্ভুত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন।

"নবীবংশে" আরও দেখা যায়, চারি বেদকে "আল্লার কালাম" বা ঐশী বাণী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কবির মতে,—

"এই চারি বেদেতে সাক্ষি দিছে করতার।
অবশেষে মোহাম্মদ ব্যক্ত হইবার॥"

অথচ, এইরূপে ভিন্ন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া, যেই শেষপ্রেরিত পয়গম্বর হজরত মুহম্মদের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইতেছে, তাঁহাকেই খোদার অংশ এবং খোদার মুহম্মদরূপী অভিব্যক্তি বলিয়া অবতার পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন,—

"মোহাম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিল হইতে প্রচার॥"

শুধু হজরত মুহম্মদকে অবতারের পর্য্যায়ে ফেলিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি আরও বলিলেন, পৃথিবীতে যত নবী (Prophet) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই অবতার; কেন না—"অবতার যারে বলি নবী বলি তারে।"

ইস্‌লামের উপর এইরূপে অবতারবাদ আরোপ করিয়া, শাস্ত্রীয় ইস্‌লামবিরুদ্ধ ধারণা লইয়াই "নবীবংশের" আরম্ভ। তাই দেখিতে পাই,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও হরি বা কৃষ্ণকেও নবী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; ব্রহ্মার উপর সাম, বিষ্ণুর উপর যজু, মহেশ্বরের উপর ঋক্ এবং হরির উপর অথর্ব্ব বেদ নামক চারিটি ঐশী বাণী, সৃষ্টির প্রথম যুগে প্রেরিত হইল। কিন্তু একে একে কালক্রমে সমস্ত ঐশী বাণী ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায়, বেদগুলি সমুদ্রের জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তৎপর আদম, শীশ, ইদ্রিস, নুহ, ইব্রাহীম, মুসা, দাউদ, সোলয়মান, ইসা ও মুহম্মদ পৃথিবীর পাপ ধ্বংস করিয়া "তৌহীদ" অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের নিছক একত্ব প্রচার করিবার জন্য জগতে প্রেরিত হইলেন।

কবির পরমার্থসঙ্গীত

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কবি সৈয়দ সোলতানের কতকগুলি পরমার্থসঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার এই সঙ্গীতগুলি ভগবৎপ্রেম-সিক্ত হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস। কবি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক; চৈতন্যদেবের তিরোভাবের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে কবির সমস্ত কাব্য লিখিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার পরমার্থসঙ্গীতগুলিতে বৈষ্ণব প্রভাব মোটেই দৃষ্ট হয় না। এই সঙ্গীতগুলি গভীর তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ বলিয়া, কোন কোন স্থলে ইহারা হেঁয়ালীর আকার ধারণ করিয়াছে। তথাপি গানগুলি কবির ঐশী প্রেম-ধারায় অভিষিক্ত হইয়া 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে। এই গানগুলির কোন কোনটিতে যে উদাস ও বৈরাগ্য ভাবের অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায়ের কোন কোন গানে দেখিতে পাই। নিম্নে আমরা তাঁহার কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

১

ধানসি কেদার

রে মন!

কত না কহিমু, কাত নিবেদিমু,
কত না চেতাইমু তোকে।
দিনের ভিতরে, নাম নিরঞ্জন,
বারেক না লইলুঁ মুখে ॥ ধু।
পুত্র পরিজন, সব অকারণ,
ভুলি রৈলুঁ মাআ মোহে।
জেন আখি ঠাঁর, লোভ দআ চুর (?)
গোরমএ বাঝি রহে ॥ (?)
সম্পদ সহাএ সুখ বেবসাএ
প্রভুপদ না সেবিলে।
গতি গুরু ভার জেহেন কাণ্ডার,
পঙ্কমএ আটকিলে ॥
কহে ছুলতান জীবন স্বপন,
মরণ জানিঅ সার।
সো পন্থ ছুরিআ অসারে মর্জ্জিআ
ভুলিআ রৈলুঁ অনিবার ॥

২

কাফিআ রাগ

কাহে কাহে ধনি বাগ বানাআ।
দুনিআ মিছা ধান্ধা মাআ লাগাআ ॥ ধু।
তুহ্মি আহ্মার গুরুজি আহ্মি তোর চেলা।
তোর দরসন বিনু ফিরিএ একেলা ॥
হুঙ্কারে মারোহোঁ তির দুরে গিআ লাগে।
ফিরি লাগে তির কামানেরি আগে ॥
সোনা কর ছিড়িআ রূপা করো বাটা।
সখি গেঁও সব সরে উরি গেঁও হাটা ॥
কহে ছোলতানে এ ধর খাখারা।
জাইব মনুরা সব ফানারা ॥

৩

রাগ ভৈরব

হাম্ ভিখারি পরম দেব দাতা।
পিউ পেআছি ধেআনে মদমাতা ॥ ধু।
খিতি সিঙ্গাসন বাসন মেরি।
অষ্ট সসির মৌর চামরধারি ॥
শ্রীনবদণ্ড ছত্র আকার।
চান্দ সুরুজ দোহো শোভএ তার ॥
দুই ভুজা জছ (?) পাএ হাহ্মারি।
তাহে কি বোলসি কাজ অনুসারি ॥
অজপা পঞ্চ শবদ ঘরি ভালে।
শ্রীহট নগরে বাজএ একতালে ॥
কহে ছৈঅদ ছোলতানে মনে হাহ্মারি।
পহু দাতা ছোলতান পরম ভিখারি ॥

৪

রাগ ছুহি

জাইবা, জাইবারে, জাইবানি রে মন
জাইবা নিরঞ্জনপুরে।

কাঞ্চনমন্দিরে বন্ধুরে রাখিআ
মুঞি পাপী আইলুঁ দূরে ॥ ধু ।
হাম পরবাসী, দূর হোন্তে আঁসি
রহি গেলুং এহি ঠাই ।
দিন দুই চারি, রৈছি বাসা করি,
না জানি কোন্‌খানে জাই ॥
মুরার উপরে, বুরা টঙ্গি হেটে
হেটে জবুনার ধারা ।
উত্তর দক্ষিণে, দুগাছি বাহনে,
মাঝে নব গিরি পারা ॥
সঙ্গে আছে মোর, দুই তিন ঢঙ্গর,
ঢেঙ্গরি উদ্দেশে ধাএ ।
জেহেন বিলালে, সরা দুগ্ধ পাইলে
খাইবারে ধরফরাএ ॥
জেবা আছে বুরি, বাসাটি পসরি,
সেহো পরবুদ্ধি ভুলি ।
চারি কড়ার তেল, সব বিলানে গেল,
ভাণ্ড হই গেল খালি ॥
বাপের দিনের, কড়া দুই তিন,
পুরাণ সঞ্চিত ধন ।
পাড়ার লোকে, সেহ নিবারিআ
সদাএ নিবারে মন ॥
কহে ছোলতানে, কর অবধান
এহি গৃহে নাহি কাজ ।
জাতি কুল ভএ, গুণি মর্ম্ম দএ
আর সভামধ্যে লাজ ॥

৫

রাগ বসন্ত

কত কত মোহন মোহোনি জান ॥ ধু ॥
কুটিল কুন্তল ফান্দ, বেড়িআছে মুখচান্দ
গুপিগণে বাজাইতে আস ।
জেহেন নির্ম্মল সসি, ঢাকিছে জলদে আসি,
দেখা দিলে তিমির বিনাস ॥

সুগন্ধি তিমির কেশ রহিছে মোহোন ভেস,
মুখচান্দ রহিছে ছাপাএ।
একবারে অনুপাম, নিসি দিসি একহি ঠাম,
লক্ষিবারে লৈক্ষ্যণ ন জাএ ॥
কিবা রাত্র কিবা দিন, নহে রূপ ভিন্নাভিন
এ চান্দ সুরুজ নহে তার।
ছৈঅদ ছোলতানে কহু, সেই সে আহ্মার পহু
দেখা না দে বিদিত সভার ॥

৬

ছুহি রাগ

অরে নিরঞ্জন জাতে দর্ব্বেস জ্ঞাআনে পরম জুগি ॥ ধু ॥

আহ্মিত ব্রাহ্মণ চাসা, গগনে আহ্মার বাসা,
ভাট ভ পড়ি আহ্মি বসি।
মুখ মোহোর হাল, জিভ্যা মোহোর ফাল,
অমূল পরাণ ভুমি চসি ॥
আহ্মিত ব্রাহ্মণ বরু, আপ্তি ঐক্ষর পরি যুরু,
রবি সসি তিন সৈন্ধা করি।
ভাণ্ডার ঘর বান্ধি, নব দুআর ছান্দি,
মনসের সঞাল (বা সঞনে) নগরি ॥
কাআ মোর কামিনী, পাইআ সিদ্ধার বাণী,
সোআমী সে ধরিমু একজন।
পাইআ ব্রাহ্মের বেদ, চতুরদিগে করি খেদ,
রবি সসি আঞন জ্ঞান ॥
ডাইনে মোর করি সার, সিরে পবি দস্তার,
ছল্লা মৈদ্ধে মছল্লা পারি।
হিআর মাঝারে বোধা, ভাবিলে পাইবা সোধা,
সুন্ন মাঝে নমাজ গুজারি ॥
কহে ছৈঅদ ছোলতান, মনে করি অনুমান,
জ্ঞানজোগ করি অলঙ্কার।
সুমেরু সিখর ভেদি, গগনে জ্বালাও বাতি,
দিলে মুখে এক করতার ॥[১২]

মুহম্মদ্ এনামুল্ হক্

১২। এই প্রবন্ধ প্রণয়নকালে আমি চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত সাহিত্য-সাধক মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহোদয়ের নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া, তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।—লেখক।

উত্তররাঢ়ে সেন-রাজধানী*

গত ১৩৩৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয় "লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধে শক্তিপুরের তাম্রশাসনের পাঠ ও প্রতিলিপি প্রকাশ করেন[১]। এই প্রবন্ধে সেনবংশের পরিচয়ে বিশেষ কোন নূতন তথ্য না থাকিলেও রাজকীয় স্থানবিভাগ সম্বন্ধে একটী নূতন সংবাদ বাহির হয়। পুরাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই তাম্রশাসন আবিষ্কার প্রসঙ্গে ১৩৩৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—

"এত কাল পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে, প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান, এই দুই ভুক্তিতেই বিভক্ত ছিল। নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসনে দেখা যায়—কঙ্কগ্রামভুক্তি নামক আর একটী ভুক্তির স্থানও আধুনিক বঙ্গের সীমার মধ্যে করিতে হইবে। অতি সহজেই বুঝা যায় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ও বর্দ্ধমানভুক্তি বাদ দিয়া বাঙ্গালা দেশের যতটুকু থাকিবে, তাহাই কঙ্কগ্রামভুক্তি বলিয়া ধরিতে হইবে।"[২]

শক্তিপুর তাম্রশাসন-বর্ণিত কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত শাসনভূমি সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়া, ভট্টশালী মহাশয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানের প্রায় সম্পূর্ণ বীরভূম জেলা এবং মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী-পশ্চিমস্থ অর্দ্ধাংশ লইয়া কঙ্কগ্রামভুক্তি গঠিত ছিল[৩]।

ভট্টশালী মহাশয় কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ভূখণ্ড সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিলেও তিনি 'কঙ্কগ্রাম' নাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়াছেন। যেমন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির নামকরণ হইয়াছে, সেইরূপ কঙ্কগ্রাম হইতে যে কঙ্কগ্রামভুক্তির নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ এই কঙ্কগ্রাম সম্বন্ধে তিনি কিছুমাত্র আলোচনা করেন নাই।

অল্প দিন হইল, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় 'প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ' সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি কঙ্কগ্রাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

'কঙ্কগ্রাম নামে একটী ভুক্তি হইয়াছিল, সে নাম সহজে লুপ্ত হইতে পারে না। ...... কঙ্কগ্রাম হইতে কাঁকগ্রাম হইবার কথা। এখন কাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ ও বর্দ্ধমান জেলার উত্তর সীমায় ই-আই রেলের পূর্ব্বে।......কাগ্রামে নদী নাই। ইহার চারি পাঁচ মাইল পূর্ব্বে ভাগীরথী, আট নয় মাইল দক্ষিণে অজয়। যেমন বর্দ্ধমান সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, কঙ্কগ্রামও সেইরূপ প্রাচীন হইতে পারে।... কঙ্কগ্রাম কাঁক বকের গ্রাম। হয় ত জোয়ারের জল সে কালে কঙ্কগ্রাম পর্য্যন্ত প্লাবিত করিত। তথাপি ভাগীরথীর চারি মাইল পশ্চিমে সরাইতে পারা যায় না। কিন্তু বলিতে পারি, কঙ্কগ্রাম ভাগীরথীর কূলে

---

* [illegible]এ আষাঢ়, ১৩৪১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ সাল, ২১৬-২২৫ পৃষ্ঠা।

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯ সাল, ৮৫ পৃষ্ঠা।

৩। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯ সাল, ১২ পৃষ্ঠা।

ছিল। তখন কাটোয়া সবডিভিশনে কান্দুড়নদী অজয় ছিল। ভাগীরথী ও অজয় দুইই সরিয়া গিয়াছে, পূর্ব্ব-কালের ভূভাগ পরে বর্দ্ধমান জেলার ঈশান কোণে খোঁচ হইয়া রহিয়াছে। ইহা কিন্তু বহু পূর্ব্বকালের কথা৪।”

ভট্টশালী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশের পর কঙ্কগ্রাম সম্বন্ধে আমার বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়াছিল। তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আমি অন্যত্র কঙ্কগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি৫।

কঙ্কগ্রামের মূল উপাদান শক্তিপুর-শাসনখানি সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে, এবং তিন বর্ষকাল সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই তাম্রশাসনোক্ত বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এ অবস্থায় আমার বক্তব্যও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি।

‘যেমন বর্দ্ধমান সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, কঙ্কগ্রামও সেইরূপ প্রাচীন হইতে পারে।’—বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই অনুমান উপেক্ষার বিষয় নহে। বাস্তবিক বাঙ্গালা প্রদেশ যে বহু বিভাগে প্রাচীন কাল হইতেই বিভক্ত ছিল, চীন পরিব্রাজক য়ুঅং চুঅংএর বর্ণনা হইতে তাহার পরিষ্কার প্রমাণ পাই। চীন পরিব্রাজক তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রাচ্য ভারতের রাজকীয় বিভাগ ও তাহার আয়তন এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

মগধ	...	৫০০০ লি	সমতট	...	৩০০০ লি
ইরিণ বা হিরণ্য পর্ব্বত		৩০০০ লি	তাম্রলিপ্তি	...	১৪০০ লি
চম্পা	...	৪০০০ লি	কর্ণস্মুবর্ণ	...	৪৪৫০ লি
কজঙ্গল	...	২০০০ লি	উড্র	...	৭০০০ লি
পুণ্ড্রবর্দ্ধন	...	৪০০০ লি	কোঙ্গোদ	...	১০০০ লি
কামরূপ	...	১০০০০ লির অধিক			

পরিব্রাজক কজঙ্গলের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—“তিনি চম্পা হইতে পূর্ব্বদিকে ৪০০ লির অধিক ভ্রমণান্তর ‘কিএ (ক)-চু-বেং-কি-লো’ [Kie (ka)-chu-wen (?-k‘i-lo] দেশে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানের পরিধি ২০০০ লির উপর; ইহা নিম্ন ও আর্দ্র এবং শস্যশালী। এই দেশের জলবায়ু উষ্ণ। এখানকার লোকসমূহ সরল, উচ্চ জ্ঞান ও বিদ্যার পক্ষপাতী। এখানে ৬।৭টী বৌদ্ধ মঠ এবং তিন শতের অধিক সন্ন্যাসী ছিল; ১০টী দেবমন্দির ছিল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসমূহ বিমিশ্র ভাবে বাস করিত। পরিব্রাজকের আগমনের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে স্থানীয় রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল। দেশটী প্রতিবেশী কোন রাজার অধিকার-গত হইয়াছিল এবং রাজধানী পরিত্যক্ত হইয়াছিল। লোকজন সহরে ও গ্রামে বাস করিত। সুতরাং রাজা শীলাদিত্য পূর্ব্বভারতে গমনকালে যখন এই স্থানে সভায় বসিয়াছিলেন, তখন তিনি তৃণদ্বারা এখানে কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং প্রস্থানকালে ঐ সকল কুটীরে অগ্নি সংযোগ করিয়া গিয়াছিলেন। এই দেশের দক্ষিণভাগে বহু বন্য হস্তী বাস করিত।

৪। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০ সাল, ২য় সংখ্যা, ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা।

৫। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ।

উত্তরভাগে গঙ্গা নদীর অনতিদূরে প্রস্তর ও ইষ্টকে নির্ম্মিত এক উচ্চ প্রাসাদ ছিল। উহার ভিত্তি প্রশস্ত ও উচ্চ এবং উহার কারুকার্য্য মনোহর ছিল। প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে বুদ্ধ এবং দেবগণের বিভিন্ন প্রকারের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ ছিল[৬]।"

প্রাচ্য ভারতের যে রাষ্ট্রবিভাগ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, এতন্মধ্যে মগধ, ইরিণ ও চম্পা বেহার এবং উড্র ও কঙ্গোদ উড়িষ্যায়; এ ছাড়া কামরূপ পৃথক্ রাজ্য হইতেছে। এই কয় বিভাগ ব্যতীত কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ, এই পাঁচটী গৌড়-বঙ্গের মধ্যে পড়িতেছে। ভট্টশালী মহাশয় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সীমা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির পূর্ব্বসীমা আমরা মোটামুটি বিশুদ্ধরূপেই নির্দ্দেশ করিতে পারি। একেবারে উত্তরে করতোয়া নদী। ঘোড়াঘাটের সমসূত্রে পূর্ব্বদিকে একেবারে সমুদ্র পর্য্যন্ত। কিন্তু এই সীমানার মধ্যস্থিত ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাংশ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল কি না, সেই বিষয় মীমাংসা করিবার মত উপকরণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সমুদ্র। পশ্চিমসীমা স্থির করিতে বিচার আবশ্যক। নারায়ণপালের ভাগলপুরশাসন-প্রদত্ত গ্রাম তীরভুক্তির অন্তর্গত এবং দেবপালদেবের মুঙ্গেরলিপি শ্রীনগরভুক্তি অর্থাৎ পাটলিপুত্রভুক্তির অন্তর্গত। এই দুই ভুক্তি যথাক্রমে মিথিলা ও বিহার বলিয়া অধুনা পরিচিত।...................তীরভুক্তি ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে কুশী নদীই ছিল সীমানা।"............... (ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার মধ্যে) "জাবেড়িয়া, মলয়া ও রামদেবপুরের অবস্থান দেখিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, বর্ত্তমান ভাগীরথীস্রোতই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির দক্ষিণভাগের পশ্চিম সীমা ছিল।"

লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর-শাসন ও বিজয়সেনের বারাকপুর-শাসন হইতে ভট্টশালী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন—ভাগীরথীই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ও বর্দ্ধমানভুক্তির মধ্যস্থ সীমা হইতেছে। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান ডিভিসনকেই মোটামুটি বর্দ্ধমানভুক্তি ধরিয়া লইতে পারি। এই বর্দ্ধমানভুক্তিই চীন পরিব্রাজকের সময় কর্ণসুবর্ণ এবং তৎপূর্ব্বে রাজা জয়নাগের সময় ঔদম্বরভুক্তি বলিয়া পরিচিত ছিল।

দক্ষিণাপথপতি রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় শৈললিপিতে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ের সহিত যে দণ্ডভুক্তির উল্লেখ আছে, তাহা ভট্টশালী মহাশয় ময়ূরভঞ্জ ও বৈতরণীর উত্তর ও সিংহভূম জেলার পূর্ব্বে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলা মনে করেন। চীন পরিব্রাজক যে তাম্রলিপ্তি ভূভাগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই যেন দণ্ডভুক্তি মনে হইতেছে। ভট্টশালী মহাশয় চট্টগ্রামকে সমতটের মধ্যে ফেলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশও সমতটের মধ্যে পড়িয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ণিত রাষ্ট্রবিভাগ ও ভুক্তিগুলির অবস্থান আলোচনা করিয়া মনে হইতেছে,—চীন পরিব্রাজক যাহা 'কজঙ্গল' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যেন পরে কঙ্কগ্রামভুক্তি হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক ঠিক কি নাম ধরিয়াছেন, তাহার অক্ষর-বিন্যাস লইয়া গোলযোগ। প্রসিদ্ধ চীনভাষাবিৎ জুলেঁ 'কিএ-চু-উ-খি-লো' (kie-chou-ou-khi-lo) পাঠ স্থির করিয়া, তাহার মূল রূপ 'কজুঘির' এবং ওয়াটার্স্ সাহেব 'ক-চু-বে-কি-লো' পাঠ স্থির করিয়া, মূল 'কজঙ্গল' বা 'কজঙ্গলা' নাম প্রকাশ করিয়াছেন[৭]। এদিকে বৌদ্ধ-

৬। Thomas Watters—On Yuan Chwang's Travels, Vol. II, pp. 182-183.
৭। Thomas Watters—On Yuan Chwang's Travels, Vol. II, p. 182.

ধর্ম্মগ্রন্থে 'কজঙ্গল' জনপদ পাইতেছি[৮]। এ অবস্থায় 'কজঙ্গল' নামই প্রকৃত মনে হইতেছে।

পুরাবিদ্ কানিংহাম সাহেব তাঁহার 'ভারতের প্রাচীন ভূবৃত্তান্তে' কজঙ্গলকে কাঁকজোল বা বর্ত্তমান রাজমহল স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্ষুদ্র কাঁকজোল রাজ্য যখন স্বাধীন ছিল, তৎকালে রাজমহলের দক্ষিণ ও পশ্চিমে অবস্থিত সমুদয় পার্ব্বতীয় ভূভাগ, এবং গিরিরাজি ও ভাগীরথী নদীর দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত সমুদয় সমতল ভূভাগ এই ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চীন পরিব্রাজকের বর্ণনায় ইহার ভূপরিমাণ প্রায় ৩০০ মাইল হইবে[৯]।

কিন্তু সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে যে 'কযঙ্গল' ভূমিপতির উল্লেখ আছে, এই 'কযঙ্গল,' চীন পরিব্রাজকের 'ক-চু-বে-কি-লো' এবং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের 'কজঙ্গল' অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। এই কজঙ্গল জনপদ পরে কেবল জঙ্গল বা জাঙ্গল নামে পরিচিত হইয়াছিল। ভবিষ্য-পুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ড নামক পুথিতে রাঢ়দেশের অন্তর্গত জঙ্গলবিভাগ 'রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গল' নামে বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে সমস্ত পরিচয় উদ্ধৃত হইল। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে,—

"অথেদানীং রারীখণ্ড-জাঙ্গলং দেশো রিচ্যতে।
দারিকেশাদুত্তরে চ দ্বাষ্টযোজনমানতঃ ॥ ১
পঞ্চকূটপার্শ্বভাগে ভাগীরথ্যাশ্চ পশ্চিমে।
জাঙ্গলো রারীখণ্ডশ্চ দেশঃ কীকটসন্নিধৌ ॥ ২
শালার্জ্জুনসাকটানাং কণ্টকানাঞ্চ ভূরিশঃ।
কাননানি কলৌ বিপ্রা ভবিষ্যন্তি মহত্তরাঃ ॥ ৩
বৈদ্যনাথমহাদেবো রারীখণ্ডে চ তিষ্ঠতি।
কলিকালে নৃণাং বিপ্রাঃ...কামপ্রদায়কাঃ ॥ ৪
নানাদেশীয়লোকৈশ্চ বৈদ্যনাথঃ প্রপূজ্যতে।
বক্রেশ্বরো মহাদেবো রারীখণ্ডসমীপতঃ ॥ ৫
বীরভূমিপ্রদেশেষু সদা প্রত্যক্ষরূপকঃ।
রারীখণ্ডকাননেষু অজয়াদ্যাঃ সরিদ্বরাঃ ॥৬
ক্ষুদ্রা মহত্তরাশ্চৈব হ্যষ্টাবিংশতিসংখ্যকাঃ।
বাহিষ্ঠাঃ কলিকালে চ ভবিষ্যন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭
ত্রিভাগজাঙ্গলং তত্র গ্রামশ্চৈবৈকভাগকঃ।
স্বল্পাভূমিরুর্ব্বরা চ বহুলা চোষরা মতাঃ ॥ ৮
রারীখণ্ডজাঙ্গলে চ লৌহধাতোঃ কচিৎ কচিৎ।
আকরো ভবিতা তত্র কলিকালে বিশেষতঃ ॥ ৯
জাঙ্গলবাসিনো মর্ত্ত্যাঃ বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ।

৮। Journal of the Royal Asiatic Society, 1904, pp. 86-88.
৯। Cunningham's Ancient Geography of India.

ভবিষ্যন্তি কলৌ বিপ্রাঃ সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিতাঃ ॥ ১০
ক্বচিৎ ক্বচিৎ বিষ্ণুনামগায়কা নিম্মলা নরাঃ।
রারীখণ্ডস্য পাবিত্র্যং তে করিষ্যন্তি ধর্ম্মতঃ ॥ ১১
কঙ্কপক্ষিযুতাঃ জ্ঞেয়াঃ জাঙ্গলমধ্যবর্ত্তিনঃ।
শ্যামবর্ণা জনাঃ সর্ব্বে ধনুর্ব্বিদ্যাপরায়ণাঃ ॥ ১২

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে আমরা পাইতেছি,—পশ্চিমে কীকট বা মগধসীমা বৈদ্যনাথ দেওঘর হইতে বীরভূমের বক্রেশ্বর এবং উত্তরে গঙ্গা ও দক্ষিণে অজয় নদ এই জাঙ্গল বা জঙ্গল দেশের অন্তর্গত ছিল। চীন পরিব্রাজকের সময় 'ক-জঙ্গল' বা অল্পজঙ্গল নাম ছিল, পরে রাঢ়ীখণ্ডের জাঙ্গল বা জঙ্গল বলিয়া পরিচিত হয়। সাঁওতাল পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা ইহার অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, ভট্টশালী মহাশয় যে ভূমিবিভাগ কঙ্কগ্রামভুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যেন 'ক-জঙ্গল' বা 'জাঙ্গল' জনপদ হইতেছে। রাঢ়ের প্রধান অংশ বলিয়া রাঢ়ীয় খণ্ডের অপভ্রংশে 'রারীখণ্ড' নামে পরিচিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। ব্রহ্মখণ্ডে সমাজস্থানগুলির উল্লেখ নাই। তবে ১২শ শ্লোকে "কঙ্কপক্ষিযুতাঃ জ্ঞেয়াঃ জাঙ্গলমধ্যবর্ত্তিনঃ।" এই উক্তিতে যেন জাঙ্গল দেশের মধ্যবর্ত্তী কঙ্কগ্রামের ক্ষীণ স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে।

গৌড়ের মধ্যে রাঢ় দেশ সেনবংশের প্রথম লীলাস্থল। বল্লালসেনের সীতাহাটী শাসনে লিখিত আছে,—

"বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্য্যানিরূঢ়ি
প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ।
শশ্বদ্বিশ্বাভয়বিতরণস্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ
কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিতবিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ ॥
তেষাং বংশে মহৌজাঃ প্রতিভটপৃতনাম্ভোধিকল্পান্তসূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লাসলীলামৃগাঙ্কঃ।
আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণমনোরাজ্যসিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপধিকরুণো ধাম সামন্তসেনঃ ॥"
(৩য় ও ৪র্থ শ্লোক)

উদ্ধৃত পরিচয় হইতে বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজা বল্লালসেনের প্রপিতামহ সামন্তসেন রাঢ়দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সেনবংশীয় রাজপুত্রগণ এই রাঢ়দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া সদাচারচর্য্যার খ্যাতিগৌরবে রাঢ়মণ্ডল অতুল প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন।

এখন কথা হইতেছে—রাঢ়ের মধ্যে কোথায় সেই সেনরাজবংশের লীলাস্থান? সৌভাগ্যের বিষয়, যে কঙ্কগ্রাম লইয়া আলোচনা চলিতেছে, সেই কঙ্কগ্রামই এক সময়ে সেনবংশের অধিষ্ঠানকেন্দ্র ছিল, ইদিলপুরের লক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মঘটকের তালপত্রের কুলগ্রন্থ

হইতে আমরা ইহার সন্ধান পাইয়াছি। বিশেষ প্রয়োজন মনে করিয়া তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি[১০]।—

"অথ স্থাননির্ণয়ঃ।

হরির্গোণঃ বটঃ কোণো বর্দ্ধমানঃ মধুস্তথা।
কঙ্ককর্ণৌ চ রাঢায়াং কায়স্থানাং কুলাষ্টকং॥
সিংহো দাসস্তথা ঘোষপালিতৌ বিষ্ণুরেব চ।
নাগো নাথশ্চ দামশ্চ কুলাষ্টং হরিপুরে।
আঢ্যো দাসস্তথা নন্দি-দেব-সেন-করস্তথা।
চন্দ্রো গোনগরে বিষ্ণু কুলাষ্টং বসন্তি চ॥
মিত্রো রক্ষিতো দামশ্চ দত্তঘোষোঽঙ্কুরো বসুঃ।
দেবঃ অস্মিন্ বটগ্রামে কুলাষ্ট বসন্তি চ॥
দামদেবস্তথা দত্তঃ করঃ চন্দ্রস্তথৈব চ।
শীলো ভদ্রবসুশ্চৈব কোণোগ্রামে কুলাষ্টকং॥
কুণ্ডদেবস্তথা দাসঃ চন্দ্রো ভদ্রঃ করস্তথা।
পালসেনাবপি খ্যাতৌ বর্দ্ধমানে কুলাষ্টকং॥
গুহো নন্দন-সিংহৌ চ দাসদত্তশ্চ পঞ্চমঃ।
দামদত্তশ্চ রুদ্রশ্চ মধুগ্রামে কুলাষ্টকং॥
কঙ্কগ্রামে পরং সেনকুলমত্র বিদ্যতে।
গুহেনাপি কৃতং ছিন্নং কিং কার্য্যং কথিতং নরৈঃ॥
সিংহদত্তস্তথা কুণ্ডঃ পালদেবস্তু পঞ্চমঃ।
রাহো ভদ্রশ্চ গুহশ্চ কর্ণস্বর্ণে কুলাষ্টকং॥
কোণাৎ বসু বটাৎ ঘোষো বর্দ্ধ(মানাৎ) মিত্রস্তথা।
কঙ্কগ্রামে সমানীতাঃ বল্লালেন প্রতিষ্ঠিতাঃ[১১]॥"

উদ্ধৃত প্রাচীন কুলকারিকা হইতে পাইতেছি, রাঢদেশে কায়স্থগণের হরিপুর, গোন বা গোনগর, বটগ্রাম, কোণ, বর্দ্ধমান, মধুগ্রাম, কঙ্কগ্রাম ও কর্ণস্বর্ণ বা কাণসোনা, এই আটটী প্রধান সমাজস্থান ছিল। এই আট সমাজের মধ্যে কঙ্কগ্রাম ব্যতীত অপর সাতটীর প্রত্যেকটীতেই আট ঘরের বাস কঙ্কগ্রাম সম্বন্ধে কিন্তু এরূপ আট ঘরের উল্লেখ নাই; কেবল সেনবংশের সমাজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে,—রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক বসু, ঘোষ এবং মিত্র, এই তিন জন এই কঙ্কগ্রামে সমানীত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

১০। প্রথমে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট কঙ্কগ্রামের সন্ধান পাই। তৎপরে কায়স্থ-সমাজ পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত তালপাতার পুথির নকল আমাকে দেখিতে দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

১১। অপরাপর সমস্ত অংশ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ষষ্ঠ অংশে উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্য বোধে এখানে সমস্ত উদ্ধৃত হইল না।

"কঙ্কগ্রামে সমানীতাঃ বল্লালেন প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥" এই উক্তি হইতে কঙ্কগ্রাম বল্লালের অধিষ্ঠানভূমি এবং বসু, ঘোষ ও মিত্র, এই তিন ঘরের কুলমর্য্যাদা প্রাপ্তির স্থান হইতেছে। গোনর ও কোণসোনাতেও সেনের সমাজ ছিল। সেই দুই সমাজের সেন আলম্যান গোত্র ও কঙ্কগ্রামের সেনবংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্[১২]।

একমাত্র সেনবংশের প্রধান সমাজ ও অধিষ্ঠানভূমি কঙ্কগ্রামই বল্লালসেনের সীতাহাটী-শাসনবর্ণিত সেনরাজবংশের লীলাস্থল বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্বকালে এ অঞ্চল কজঙ্গল বা জাঙ্গল বলিয়া পরিচিত থাকিলেও সেনবংশের অধিকারে এই কেন্দ্রস্থান কঙ্কগ্রামের নামানুসারে এখানকার সমস্ত ভূভাগ কঙ্কগ্রামভুক্তি বলিয়া পরিচিত হয়। আমি মনে করি, এই কজঙ্গল বা অল্প জঙ্গলময় প্রদেশে ভাগীরথী-তীরে বল্লালসেনের প্রপিতামহ সামন্তসেনের পূর্ব্বপুরুষ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে স্পষ্টই লিখিত আছে,—

> "উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্মৃগশিশুরসিতাখিন্নবৈখানসস্ত্রী-
> স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি।
> যেনাসেবান্তশেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
> পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি ॥" (৯ম শ্লোক)

অর্থাৎ 'যে স্থান আজ্যধূমের সুগন্ধে আমোদিত, যেখানে মৃগশিশু বৈখানস-রমণীগণের স্তন্যক্ষীর পান করিত, যে স্থান শুকপক্ষিগণের ব্রহ্মপারায়ণ বা বেদপাঠ-পরিচিত; ভবভয়াক্রান্ত ধার্ম্মিক তপস্বিগণে যে স্থল পরিপূর্ণ, সেই গঙ্গার পবিত্র পুলিনে অরণ্যময় পুণ্যাশ্রমে যিনি বৃদ্ধ বয়স অতিবাহিত করিয়াছিলেন।' উক্ত বর্ণনায় গঙ্গাতটস্থ অরণ্যময় কজঙ্গল বা জঙ্গলভূভাগের পরিচয় দিতেছে—এখানে তপস্বিগণপরিপূর্ণ কঙ্কগ্রাম খুঁজিতে হইবে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সুপ্রাচীন এড়ুমিশ্র ও হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে,—

> "কামঠী ব্রহ্মপুরী চ হরিকোটিস্তথৈব চ।
> কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম এযাং স্থানানি পঞ্চ চ[১৩] ॥"

আদিশূরের সভায় ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে যে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আগমন করেন, তাঁহারা গঙ্গাতটে উক্ত পঞ্চ গ্রাম পাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সমাগমে ঐ স্থান বৈদিক ক্রিয়াকলাপে মুখরিত হইয়াছিল। পঞ্চ গ্রামের মধ্যে কঙ্কগ্রামেই সম্ভবতঃ সামন্তসেন বাস করিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানে বৈদিক উপনিবেশ

১২। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ, ৮২পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৩। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ (২য় সংস্করণ) ১১২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐই পঞ্চগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থান লইয়া উক্ত ব্রাহ্মণকাণ্ডে বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই এক্ষণে কল্পনামূলক বলিয়া মনে হইতেছে। প্রাচীন কায়স্থকুলপঞ্জিকাবর্ণিত অষ্ট সমাজ এবং পঞ্চব্রাহ্মণশাসন সেনরাজধানীর নিকটই হইতেছে।

হইয়াছিল। বিজয়সেন সমগ্র গৌড় রাঢ় অধিকার করিয়া বিজয়পুরে রাজধানী করিলেও বল্লালসেন তাঁহার এই পৈতৃক শাসনকেন্দ্র পরিত্যাগ করেন নাই। প্রাচীন কুলগ্রন্থে স্পষ্টই রহিয়াছে যে, 'এই কঙ্কগ্রামেই বল্লালসেন বসু, ঘোষ ও মিত্র, এই তিন জনকে কুল-মর্য্যাদা দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এক সময় ব্রাহ্মণশাসন হেতু এই স্থান সাগ্নিক বিপ্রগণের আশ্রম বলিয়াও পরিচিত ছিল। সাগ্নিক বিপ্রগণের কামটী, ব্রহ্মপুরী, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম এবং কায়স্থকুলপঞ্জিকাবর্ণিত হরিপুর, গোনর, বটগ্রাম, কোণ, মধুগ্রাম, কঙ্কগ্রাম ও কর্ণ (কাণসোনা) এই ৭টী গ্রামই উত্তররাঢ়ে হইতেছে। কেবল বর্দ্ধমান মধ্যরাঢ়ে পড়িতেছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—উক্ত পঞ্চ শাসন বা অষ্ট সমাজের কেন্দ্র ছিল কঙ্কগ্রাম। এই কঙ্কগ্রাম কেবল সৌকালীনগোত্র সেনের আদিসমাজ হইতেছে। কঙ্কগ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানায় এখন কা-গ্রাম নামে পরিচিত। এই স্থান যে এক সময়ে কাঁকগ্রাম নামে পরিচিত ছিল, তাহারও সন্ধান পাইয়াছি। কাগ্রামের নিকটবর্ত্তী মৌগ্রাম নরসিংহপুরনিবাসী এক মুসলমান ডাক-পিয়ন আমাদের নিকটস্থ বাগবাজার ডাকঘরে কাজ করিতেছে। তাহাদের প্রাচীন দলিলপত্রে এই স্থান 'কাকগ্রাম' নামেই বর্ণিত হইয়াছে। কাকগ্রামের পার্শ্বেই আজও 'সেনপুর' বিদ্যমান, তাহা প্রাচীন সেনবংশের সংস্রব সূচিত করিতেছে। এইরূপ মৌগ্রামের (প্রাচীন মধুগ্রাম) এক অংশে 'নরসিংহপুর' সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতবর্ণিত কজঙ্গলীয় নরসিংহার্জ্জুনের নাম ঘোষণা করিতেছে। চীন পরিব্রাজক যে বৌদ্ধকীর্ত্তি ও দেবমন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন, পঞ্চ স্তূপের অপভ্রংশে পাঁচথুপী নাম এবং কাগ্রামের তিন মাইল দূরে সালার গ্রামমধ্যে সেই প্রাচীন দেবকীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান। সালারের কুমার সাহেবদিগের পুকুরের ধারে বহু ভগ্ন মূর্ত্তি ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পড়িয়া আছে। শুনিলাম, স্থানীয় বণিক্‌গৃহে অনেক প্রাচীন দেবমূর্ত্তি ও স্থাপত্য স্থান পাইয়াছে। বলিতে কি, পাঁচথুপী হইতে সালার পর্য্যন্ত প্রাচীন ভূভাগ বাঙ্গালার পুরাবিদ্‌গণের বিশেষভাবে অনুসন্ধেয়।

স্থানীয় মানচিত্র হইতে শাসনবর্ণিত যে সকল স্থানের সন্ধান করিয়াছি, আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্নে তাহাদের নামের সঙ্গে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ প্রদত্ত হইল।—

কাগ্রাম	(কঙ্কগ্রাম)	—	অক্ষা°	২৩°৪৫´	দ্রাঘি°	৮৮°১৪´
মৌগ্রাম	(মধুগ্রাম)	—	„	২৩°৪৪´	„	৮৮°১৫´
বালুটিয়া	(বাল্লীহিত্তা)	—	„	২৩°৪৪´	„	৮৮°১২´
নিমা		—	„	২৩°৫৬´	„	৮৭°৪৮´
কোণা	(বারহকোণা)	—	„	২৩°৪০´	„	৮৮° ৯´
কুমারপুর		—	„	২৩°৪৪´	„	৮৮° ৭´
চাকুলিয়া	(চাকলিয়া)	—	„	২৩°৩৬´	„	৮৮° ৫´

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

মহাকবি কালিদাসের সময়*

মহাকবি কালিদাসের সময় এখনও অবিসংবাদিতরূপে নিরূপিত হয় নাই। কেহ বলেন যে, কবি খ্রীষ্টীয় ৫ম কিম্বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক; কেহ বা বলেন যে, তাঁহার সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী। কবি নিজে নিজের সময়োল্লেখ করেন নাই, সেই জন্যই এই সকল নানা মতের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে মহাকবির সময়, তাঁহার কাব্যগ্রন্থের জ্যোতিষিক সময়জ্ঞাপক বাক্যাবলী হইতে নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

১। মেঘাগম সম্বন্ধে কবিপ্রসিদ্ধি

আধুনিক সংস্কৃত রামায়ণে মেঘাগমের কাল সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে। যথা,—

ততঃ প্রাবৃড়্ অনুপ্রাপ্তা মম কামবিবর্দ্ধিনী ॥১৪॥
অপাস্য হি রসান্ ভৌমাংস্তপ্ত্বা চ জগদংশুভিঃ।
পরেতাচরিতাং ভীমাং রবিরাচরতে দিশম্ ॥১৫॥
উষ্ণমন্তর্দ্দধে সদ্যঃ স্নিগ্ধা দদৃশিরে ঘনাঃ।
ততো জহৃষিরে চাহপি ভেকসারসবর্হিনঃ ॥১৬॥ (অযোধ্যা, ৬৩ অঃ, ১৪-১৬)

ইহা রাম-বিবাসন-শোকগ্রস্ত রাজা দশরথের কৌশল্যার প্রতি উক্তি। দশরথ বলিতেছেন, "তার পর আমার কামবিবর্দ্ধনকারী বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। রবি পৃথিবীর রসসমুদয় দূর করিয়া এবং কিরণ দ্বারা জগৎ তাপিত করিয়া যেই মাত্র প্রেতলোকের আশ্রিত দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিলেন, তৎক্ষণাৎ উষ্ণতা পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান করিল এবং স্নিগ্ধ মেঘাবলী দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন ভেক, সারস এবং ময়ূরগণ আনন্দে পরিপ্লুত হইল।"

সুতরাং বর্ত্তমান রামায়ণের কবির মতে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইলেই মেঘাগম হইয়া থাকে। এই সময়েই সায়ন সৌর শ্রাবণ আরম্ভ হইয়া থাকে এবং যে সময়ে অশ্বিনী নক্ষত্রের আদিবিন্দুতে বাসন্ত বিষুব (Vernal Equinox) অবস্থিত ছিল, সে সময়ে নিরয়ণ শ্রাবণারম্ভও হইত। বর্ত্তমানে দক্ষিণায়ন ৭ই আষাঢ় বা ইংরাজী ২২এ জুন আরম্ভ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই সময়েই প্রকৃত মৌসুমী বর্ষণ আরম্ভ হইয়া থাকে। এই সময়েই মধ্যদেশে মেঘাগম বা প্রকৃত বর্ষারম্ভ হইত, ইহাই প্রাচীন কবি-প্রসিদ্ধি। বলা বাহুল্য, উক্ত সময়েই অম্বুবাচীপ্রবৃত্তি আজকাল হইয়া থাকে। আধুনিক রামায়ণের কবির সময়েও এই সময় সৌর শ্রাবণ আরম্ভ হইত। যথা,—

পূর্ব্বোহয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ ॥১৪॥ (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ২৬ অধ্যায়)।

---

* ১৩৪০ সালের ২৬এ চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলিতেছেন, "এইটি বর্ষাকালীয় প্রথম মাস শ্রাবণ। এক্ষণেই সলিলাগম হয়। হে সৌম্য, এক্ষণে বার্ষিক মাসচতুষ্টয়ের প্রবৃত্তি হইল।" সুতরাং সৌর শ্রাবণের আরম্ভেই দক্ষিণায়নারম্ভ, মেঘাগম এবং বর্ষাপ্রবৃত্তি, এইরূপ কবিপ্রসিদ্ধি পাওয়া যাইতেছে। ইহার সমর্থক উক্তি আমরা বরাহমিহিরকৃত "বৃহৎসংহিতা" হইতে পাইতেছি।

২। বরাহমিহির এবং বর্ষাপ্রবৃত্তি

মার্গশিরঃসিতপক্ষপ্রতিপৎপ্রভৃতি ক্ষপাকরেঽষাঢাম্।
পূর্ব্বাং বা সমুপগতে গর্ভাণাং লক্ষণং জ্ঞেয়ম্ ॥৬॥

চান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ তিথি হইতে এবং চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে গর্ভের বা মেঘসূচনার লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

যন্নক্ষত্রমুপগতে গর্ভশ্চন্দ্রে ভবেৎ স চন্দ্রবশাৎ।
পঞ্চনবতে দিনশতে তত্রৈব প্রসবমায়াতি ॥৭॥

চন্দ্র যে নক্ষত্র প্রাপ্ত হইলে যে মেঘের সূচনা হয়, তাহার এক শত পঁচানব্বই চান্দ্র দিন বা তিথি পূর্ণ হইলেই সেই মেঘের প্রসব বা বর্ষণ হয়।

১৯৫ তিথিতে ৬॥০ চান্দ্র মাস হয়। অর্থাৎ মেঘের সূচনার ৬॥০ চান্দ্র মাস অতীত হইলে বর্ষণ হয়। আমরা সম্প্রতি বরাহের উক্তিগুলির অর্থ গ্রহণ করিতেই প্রয়াস পাইতেছি।

সিতপক্ষভবাঃ কৃষ্ণে শুক্লে কৃষ্ণসম্ভবা দ্যুসম্ভবা রাত্রৌ।
নক্তংপ্রভবাশ্চাহনি সন্ধ্যাজাতাশ্চ সন্ধ্যায়াম্ ॥৮॥

শুক্লপক্ষে যে মেঘের সূচনা হইবে, তাহার কৃষ্ণপক্ষে বর্ষণ হইবে; কৃষ্ণপক্ষোৎপন্ন মেঘের বর্ষণ শুক্লপক্ষে হইবে, দিনোৎপন্ন মেঘের রাত্রিতে বর্ষণ এবং রাত্রিতে উৎপন্ন মেঘের দিনে বর্ষণ, প্রাতঃসন্ধ্যায় উৎপন্ন মেঘের দিনান্তসন্ধ্যায় বর্ষণ এবং দিনান্তসন্ধ্যায় উৎপন্ন মেঘের প্রাতঃসন্ধ্যায় বর্ষণ হইবে।

মৃগশীর্ষাদ্যা গর্ভা মন্দফলাঃ পৌষকৃষ্ণজাতাশ্চ।
পৌষস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেচ্ছ্রাবণসিতম্ ॥৯॥
মাঘসিতোত্থা গর্ভা শ্রাবণকৃষ্ণে প্রসূতিমায়ান্তি।
মাঘস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেদ্ ভাদ্রপদশুক্লম্ ॥১০॥
ফাল্গুনশুক্লসমুত্থা ভাদ্রপদস্যাসিতে বিনির্দ্দেশ্যাঃ।
তস্যৈব কৃষ্ণপক্ষোদ্ভবাস্তু যে তেঽশ্বযুক্‌শুক্লে ॥১১॥

চান্দ্র অগ্রহায়ণের প্রথম পক্ষজাত যে মেঘসূচনা হয় এবং চান্দ্র পৌষের শুক্লপক্ষজাত যে মেঘসূচনা হয়, তাহারা উভয়েই মন্দফল অর্থাৎ স্বল্পবর্ষণপ্রদ হইয়া থাকে। পৌষের কৃষ্ণপক্ষসূচিত মেঘের শ্রাবণের শুক্লপক্ষে বর্ষণ নির্দ্দেশ করিবে। মাঘের শুক্লপক্ষসূচিত মেঘের শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষে প্রসব হয়, মাঘের কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা ভাদ্রশুক্লপক্ষকে নির্দ্দেশ করিবে। ফাল্গুনশুক্লপক্ষে সূচিত মেঘের ভাদ্রকৃষ্ণপক্ষে বর্ষণ নির্দ্দেশ করিবে। ঐ মাসেরই কৃষ্ণপক্ষ-গর্ভিত মেঘ আশ্বিনশুক্লপক্ষে বারিপ্রদ হয়।

চান্দ্র অগ্রহায়ণের প্রথম পক্ষজাত মেঘ বরাহের মতে জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণপক্ষে বর্ষণ করে, এবং চান্দ্র পৌষের শুক্লপক্ষজাত মেঘ বরাহের মতে আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে বর্ষণ করে। এই দুই বর্ষণই মন্দফল বা যৎকিঞ্চিৎপরিমিত। পৌষের কৃষ্ণপক্ষসূচিত মেঘের শ্রাবণের শুক্লপক্ষে বর্ষণ হয়; এবং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক, এই চারি মাসই প্রকৃত বর্ষাকাল। শ্রাবণ-শুক্লপক্ষের আরম্ভ বর্ত্তমান পঞ্জিকায় সৌর আষাঢ়ের শেষ দিন হইতে সৌর শ্রাবণের ২৯ দিন পর্য্যন্ত হইতে পারে। পরে দেখান যাইবে যে, ভারতবর্ষে ব্যবহৃত সৌর বর্ষমান প্রকৃত নাক্ষত্র সৌর বর্ষমান হইতে প্রায় ৩ মিনিট অধিক গৃহীত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া এদেশীয় পঞ্জিকার রাশি নক্ষত্র বিভাগ যে অবস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার আদিবিন্দু খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর সময়ে ঠিক্ ছিল, অর্থাৎ এই রাশিনক্ষত্রের আদিবিন্দু ও বাসন্ত বিষুব খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে একই বিন্দু ছিল; এবং এক্ষণে সৌর শ্রাবণের আরম্ভে সূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তের যে স্থানে উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে উত্তরায়ণান্ত বিন্দু অবস্থিত ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উত্তরায়ণান্ত মেঘাগম বা বর্ষাপ্রবৃত্তি, এবং সৌর শ্রাবণারম্ভ একেবারে সমকালীন বলিয়া যে রামায়ণে কবিপ্রসিদ্ধি পাওয়া যাইতেছে, তাহা অযৌক্তিক নহে। এইরূপ কবিপ্রসিদ্ধি আরও সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই জন্য আমরা মেঘাগম এবং উত্তরায়ণান্ত সমসাময়িক ধরিয়াই মহাকবি কালিদাসের সময় নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলাম। জ্যোতিষিক গণনা করিতে একটি অন্ততঃ অবলম্বন দরকার, তাহা এইরূপে গ্রহণ করিতেছি। আমাদের যে কোন প্রকারেই হউক, অয়ন বা বিষুবস্থিতি নিরূপণ করিতে হইবে, এবং তাহা হইতেই গণনা সম্ভব হইবে। কেবল তিথি নক্ষত্রদ্বারা গণনা হয় না বা গ্রহণ দ্বারাও হয় না; কারণ, তিথি নক্ষত্রাদির পুনরাবৃত্তি ১৯ বৎসর পর পর হইয়া থাকে এবং গ্রহণের পুনরাবৃত্তি ১৮ বৎসর ১১ দিন পর পর হইয়া থাকে। বর্ষারম্ভ ও সূর্য্যের উত্তরায়ণান্ত বিন্দুগমন সমকালিক, এই অবলম্বন ভিন্ন আমরা মহাকবির গ্রন্থে অন্য অবলম্বন প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

৩। কালিদাসের মেঘাগমোক্তি

কালিদাসের কাব্যে মেঘাগম বা প্রথম বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে আমরা দুইটি উক্তি পাইয়াছি। যথা,—

> করীব সিক্তং পৃষতৈঃ পয়োমুচাং
> শুচিব্যপায়ে বনরাজি পল্বলম্।—রঘু, ৩ সর্গ, ৩ শ্লোক।

"হস্তী যেরূপ আষাঢ় (সৌর) মাসের অন্তে নূতন বৃষ্টিবিন্দু দ্বারা সিক্ত পল্বলভূমি পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ করিয়াও অতৃপ্ত থাকে, সেইরূপ।"

সুতরাং কালিদাসেরও নূতন বৃষ্টিপাত সৌর আষাঢ়ান্তেই কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। মল্লিনাথ অর্থ করিয়াছেন,—"শুচিব্যপায়ে গ্রীষ্মাবসানে।" গ্রীষ্মের অবসান কখন্ হইতে? ঋতু পরিবর্ত্তন অয়ন ও বিষুবস্থিতির উপর নির্ভর করে। সূর্য্যের বাসন্ত বিষুববিন্দুতে

পৌছানর পূর্ব্বের মাস ছিল—সৌর মধুমাস বা সৌর চৈত্র মাস, এবং পর মাস ছিল—সৌর মাধব মাস বা বৈশাখ মাস বা সূর্য্যের বাসন্ত বিষুব হইতে ৩০ অংশ গমনকাল, তার পর ৬০ অংশ গমনের কাল দুই মাস শুক্র ও শুচি বা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। সুতরাং "শুচিব্যপায়ে" গ্রীষ্মাবসানে অর্থ ধরিলে বর্ষারম্ভ উত্তরায়ণান্ত বিন্দুতে সূর্য্যের পৌছানর সময়ই বুঝায়। ইহাই কালিদাসের সময়ের শ্রাবণারম্ভ ছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, উত্তরায়ণান্ত কালিদাসের সময় কি সৌর শ্রাবণারম্ভে বা সৌর আষাঢ়ের শেষ ভাগে হইত? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতেছে কবির মেঘদূত কাব্য হইতে। যথা,—

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য **প্রশমদিবসে** মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥২॥
তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।

*   *   *

*   *   *   *॥৩॥

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥৪॥

যক্ষ এখানে আষাঢ়ের প্রশমদিবসে অর্থাৎ শেষ দিনে একখানা মেঘকে পর্ব্বতগাত্রে আশ্রিত দেখিতে পাইয়াছিল, ইহাই কবির অভিপ্রায়। এখানে আমরা বুঝিতেছি যে, সৌর আষাঢ়ের শেষ দিনে মেঘাগম। মল্লিনাথ "প্রশমদিবসে" এই পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তিনি গ্রহণ করিয়াছেন "প্রথমদিবসে"। তাঁহার অপেক্ষা প্রাচীন টীকাকার বল্লভদেব (খ্রীঃ অঃ ৯২৮; মল্লিনাথের সময় খ্রীঃ অঃ ১৪৭০; Hultzsch কর্ত্তৃক সম্পাদিত মেঘদূতের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) "আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে" এই পাঠের এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন,—

"আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে সমাপ্তিদিনে গ্রীষ্মাবসানে। কেচিত্তু শকারথকারয়োর্লিপিসারূপ্যমোহাৎ প্রথম ইত্যূচুঃ। কথং কথমপি চৈতমেবার্থং প্রতিপন্নাঃ। বর্ষাকালস্য প্রস্তুতত্বাদাদিদিনমিত্যেতত্ত্বতীব বিরুদ্ধম্"।

"আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে অর্থাৎ সমাপ্তিদিনে, গ্রীষ্মাবসানে। কেহ কেহ শকার এবং থকার, এই দুই অক্ষরের (সংস্কৃতে) একইরূপ আকার, এই মোহবশতঃ "প্রথম" এই পাঠ বলিয়াছেন, এবং কোনও রূপে এই পাঠানুযায়ী অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত, ইহাই কবির অভিপ্রায়; সুতরাং আদিদিন গ্রহণ করা অত্যন্ত বিরুদ্ধ।" সুতরাং বল্লভদেবের মতে "আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে" ইহাই শুদ্ধ পাঠ এবং "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" ইহা অশুদ্ধ পাঠ। কিন্তু মল্লিনাথ এ স্থলে এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন,—

"কেচিৎ 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' ইত্যত্র 'প্রত্যাসন্নে নভসি' ইতি বক্ষ্যমাণনভোমাসস্য প্রত্যাসত্ত্যর্থং 'প্রশমদিবসে' ইতি পাঠং কল্পয়ন্তি, তদসঙ্গতম্। প্রথমাতিরেকে কারণাভাবাৎ। নভোমাসস্য প্রত্যাসত্ত্যর্থ-

মিত্যুক্তমিতি চেন্ন। প্রত্যাসত্তিমাত্রেণ মাসপ্রত্যাসত্তৌব প্রথমদিবসস্যাপ্যুপপত্তেঃ অত্যন্তপ্রত্যাসত্তেরুপ-যোগাভাবেনাবিবক্ষিতত্বাৎ। বিবক্ষিতত্বে বা স্বপক্ষেঽপি প্রশমদিবসান্তিমক্ষণে মেঘদর্শনকল্পনায়াঃ প্রমাণাভাবেন তদসম্ভবাৎ। প্রত্যুতাস্মৎপক্ষ এব কুশলসন্দেশস্য ভাব্যনর্থপ্রতীকারার্থস্য পুরস্তাৎ এবানুমানযুক্তং ভবতীত্যুপ-যোগসিদ্ধিঃ।"

মল্লিনাথ বলিতেছেন,—"কেহ কেহ 'আষাঢ়ের প্রথমদিনে' ইহার স্থলে প্রত্যাসন্নে নভসি অর্থাৎ *'শ্রাবণ আসন্ন'* বলিয়া পরে কথিত হইয়াছে বলিয়া *'প্রশমদিনে'* এই পাঠ কল্পনা করেন; তাহা অসঙ্গত। এ স্থলে 'প্রথম' ভিন্ন অন্য পাঠ হইতে পারে না। যদি বল, শ্রাবণ আসন্ন; সুতরাং "প্রশম"ই প্রকৃত পাঠ, তাহাও নহে। কেবলমাত্র প্রত্যাসত্তি বা সান্নিধ্যের উল্লেখ আছে, তাহা মাসের প্রত্যাসত্তি বা সান্নিধ্য বুঝিলেও কোন দোষ হয় না এবং তাহাতে প্রথম, এই পাঠই সমর্থন করা যায়। অত্যন্ত প্রত্যাসত্তির প্রয়োজনও নাই, কবিও তাহা বলিতে চান নাই। যদিও তর্কস্থলে মানিয়া লওয়া যায়, অত্যন্ত প্রত্যাসত্তিই কবির অভিপ্রায়, তবে এ কথা বলা চলে যে, কবি ত এ কথা বলেন নাই—প্রশম বা শেষদিনের অন্তিম ক্ষণেই মেঘদর্শন হইয়াছে, এরূপ কথার কোনও প্রমাণ নাই, এবং ইহা অসম্ভব কথা। অন্য পক্ষে আমাদের মতে যক্ষ যখন কুশল সংবাদ প্রেরণ দ্বারা ভাবী অনর্থের প্রতীকার ইচ্ছা করিয়াছিল, তখন তাহার কিছুদিন পূর্ব্বেই সংবাদ পাঠাইবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল, এইরূপ অনুমানই যুক্তিযুক্ত।" সুতরাং মল্লিনাথের মতে "প্রথমদিবসে" ইহাই শুদ্ধ পাঠ। তার পর মল্লিনাথ "আষাঢ়মাস" শব্দে চান্দ্র আষাঢ় বুঝিয়াছেন এবং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য বিধান করিতে অক্ষম হইয়াছেন। আবার লিখিতেছেন,—"কথং তর্হি 'শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ' ইত্যাদিনা 'ভগবৎপ্রবোধাবধিকস্য শাপস্য মাসচতুষ্টয়াবশিষ্টোক্তিঃ। দশদিবসাধিক্যাদিতি চেৎ স্বপক্ষেঽপি কথং সা। বিংশতিদিবসৈর্ন্যূনত্বাদিতি সন্তোষ্টব্যম্।" অর্থাৎ যদি বল যে, প্রশমদিবসে এই পাঠই শুদ্ধ, তবে শেষে যে আছে, "শাপান্ত যে হরির উত্থানদিনে হইবে এবং তাহার আর চারি মাস বাকী আছে" ইহার কি সামঞ্জস্য হইবে? আমরা যেরূপ অর্থ করিয়াছি, তাহাতে ১০ দিন বেশী হয়। কিন্তু অপর পক্ষে তোমাদের "প্রশমদিবসে" পাঠ লইলে ত ২০ দিন কম হয়? সুতরাং আমাদের পাঠ লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে।"

চান্দ্র আষাঢ়ের শুক্লা একাদশীতে হরির শয়ন এবং চান্দ্র কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশীতে হরির উত্থান হয়। সুতরাং আষাঢ়ের প্রথম দিনে পাঠ গ্রহণ করাতে সেই দিন হইতে হরির উত্থান পর্য্যন্ত ৪ চান্দ্র মাস ও দশ দিন ঠিক হয়। আর চান্দ্র আষাঢ়ের শেষ দিন পাঠ লইলে হরির উত্থান পর্য্যন্ত ৩ চান্দ্র মাস ও ১১ দিন হয়। চারি মাস (চান্দ্র) ত কোন মতেই মিলিল না। আমাদের মনে হয়, কালিদাস আষাঢ় অর্থে এখানে চান্দ্র মাস মোটেই বুঝান নাই; তিনি বুঝাইয়াছেন, সৌর আষাঢ় মাস এবং তাহার প্রশমদিবস বা শেষ দিনই প্রকৃত অর্থ। কারণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে। উপরে মল্লিনাথ যে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা ॥১।৫॥

তাহার অর্থ এই যে, "আমার শাপান্ত, শার্ঙ্গপাণি বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যা হইতে উত্থিত হইবেন, তখন হইবে। অবশিষ্ট ৪ মাস কোনরূপে চক্ষু মুদিয়া অতীত কর।" এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, যক্ষ যে দিন মেঘকে সম্ভাষণ করিয়াছিল, তাহা হরিশয়নদিন, উহা চান্দ্র আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী তিথি, তাহার পর হইতে ৪ চান্দ্র মাস পরে কার্ত্তিকের শুক্লা একাদশীতে হরির উত্থানদিন। এখানে ৪ মাস অর্থে নিশ্চয়ই ৪ চান্দ্র মাস বা চাতুর্ম্মাস্য-কাল বুঝিতে হইবে। কারণ, হরির উত্থানদিনের সঙ্গে সংলগ্ন উক্তি রহিয়াছে। আমরা বাঙ্গালা ১৩২০ সন হইতে ১৩৩৯ সন পর্য্যন্ত ১৯ বৎসরের পঞ্জিকা হইতে পাইতেছি যে, হরিশয়নদিন ১২ই সৌর আষাঢ় হইতে ৯ই সৌর শ্রাবণের মধ্যে ঘটিতে পারে—ইহার পূর্ব্বে বা পরে সম্ভব নহে। ১৯ বৎসরে তিথি ও নক্ষত্রের পুনরাবৃত্তি হয়। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বর্ত্তমান পঞ্জিকার রাশিনক্ষত্রাবস্থান কত দিন পূর্ব্বে ঠিক্ ছিল? উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় সৌর বর্ষমান প্রকৃত নাক্ষত্র বর্ষমান হইতে অধিক গৃহীত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান পঞ্জিকার রাশিনক্ষত্রের আদিবিন্দু প্রায় চিত্রা (Spica) তারার কদম্ব প্রোতীয় স্থানের ১৮০ অংশ বা ৬ রাশি দূরে অবস্থিত হইয়াছে; এবং দৃগ্-গণিতৈক্য করিলে অয়নাংশ এক্ষণে ২২° ৫৫´৩২´´ বিকলা দাঁড়ায়। সুতরাং বর্ত্তমান রাশি বিভাগের আদিবিন্দুতে যে সময় বাসন্ত বিষুব ছিল, তাহার কাল ১৬৫০ বৎসর পূর্ব্বের অর্থাৎ ২৮৩ খ্রীষ্টাব্দের। সুতরাং বর্ত্তমান পঞ্জিকা লইয়াই কালিদাসের সময়জ্ঞাপক বাক্যের বিবেচনা করিলে তাহা দোষযুক্ত হইবে না।

হরিশয়নদিন ১২ই সৌর আষাঢ় হইতে ৯ই সৌর শ্রাবণের মধ্যেই সম্ভব বলিয়া, উহা কখনই সৌর আষাঢ়ের প্রথম দিন হইতে পারে না, চান্দ্র আষাঢ়েরও প্রথম দিনে সম্ভব নহে। মল্লিনাথও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার পাঠদ্বারাও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য ঘটে না। আমরা "আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে" এই স্থলে আষাঢ় অর্থে সৌর আষাঢ় গ্রহণ করিতেছি। কারণ, ইহার দ্বারা পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য হয়। হরিশয়ন সৌর আষাঢ়ের শেষ দিনে হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। যথা—বাঙ্গালা ৩১শে সৌর আষাঢ় ১৩২৮ সনে হরিশয়ন হইয়াছিল। তার পর ৪ চান্দ্র বা আসন্ন সৌর মাস অন্তরে হরির উত্থান ও শাপান্তকাল বেশ মিলিয়া যাইতেছে। সুতরাং আমরা যত দূর বুঝিতেছি, "আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে" ইহাই শুদ্ধ পাঠ এবং 'আষাঢ়' শব্দে এখানে সৌর আষাঢ়। শ্রাবণের প্রত্যাসত্তিও মিলিয়া যাইতেছে, এই শ্রাবণ অবশ্যই সৌর শ্রাবণ বা বর্ষারম্ভ মাস। আমরা বল্লভদেবের আদৃত পাঠই শুদ্ধ পাঠ বুঝিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, কালিদাসের সময় সৌর আষাঢ়ের শেষ দিনে মেঘাগম বা দক্ষিণায়নারম্ভ হইত। সুতরাং মহাকবির সময়ে অয়নাংশ ১°এর অধিক ছিল না। আবার রঘুবংশে "শুচিব্যপায়ে" আষাঢ়ান্তে মেঘসমাগম বা অয়নান্ত পাইতেছি; সুতরাং কালিদাসের সময় অয়নাংশ শূন্যও বিবেচনা করা যাইতে পারে। আমরা অয়নাংশ ১° ধরিয়াই কবির সময় গণনা করিতেছি।

৪। মহাকবির সময় গণনা

বরাহমিহিরকৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে মঘা তারার (Regulus) স্ফুট ১২৬° দেওয়া

আছে, সুতরাং মঘা তারার ৩৬° পশ্চাতে উত্তরায়ণান্ত বিন্দু ছিল। এক্ষণে মঘা তারার স্ফুট ১৪৯° ; সুতরাং পঞ্চসিদ্ধান্তিকার উত্তরায়ণান্ত বিন্দুর বর্ত্তমান স্ফুট ১১৩°। কালিদাসের সময় আষাঢ়ের শেষ দিনে উত্তরায়ণান্ত, সুতরাং কালিদাসের কালের উত্তরায়ণান্ত বিন্দুর বর্ত্তমান স্ফুট ১১২° ; ইহা হইতে ৯০° বাদ দিলে অয়নচলনাংশ হইতেছে ২২°।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ধ্রুবক গ্রহণ করিয়াছি। যদি আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে তারার ধ্রুবক গ্রহণ করি, তাহা হইলে মঘা তারা হইতে কবির সময়ের অয়নান্তের চলনাংশাদি ১৯° অংশ হয়। কৃত্তিকা তারা হইতে ঐ অয়নচলনাংশাদি ১৯°৪০´ কলা হয়। এই উভয়ের মধ্যম ফল ১৯°২০´ কলা। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ধ্রুবক হইতে প্রাপ্ত ২২° অয়নচলন হইতে গত কাল ১৫৮৪ বৎসর আইসে; অর্থাৎ মহাকবির কাল ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তের ধ্রুবক হইতে প্রাপ্ত ১৯°২০´ কলা অয়নগতির কাল ১৩৯২ হয় এবং মহাকবির কাল ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ হয়। যদি আর্য্যভটানুযায়ী লল্লাচার্য্যকৃত শিষ্যধীবৃদ্ধিদ মতে এই প্রণালীতে গণনা করি, তবে কালিদাসের সময় খ্রীষ্টীয় ৪৬৪ অব্দ হয়। সুতরাং কালিদাসের কালের উর্দ্ধসীমা ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ এবং নিম্ন সীমা ৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

এই গণিতফলের বিভিন্নতার একটি কারণ এই যে, কালক্রমে রাশিনক্ষত্রের আদিবিন্দু ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। উদাহরণস্বরূপে বলা যায় যে,—

পঞ্চসিদ্ধান্তিকামতে	মঘানক্ষত্রের	আদিবিন্দু	মঘাতারার	৬ অংশ	পশ্চাতে
আর্য্যভটমতে	মঘানক্ষত্রের	আদিবিন্দু	মঘাতারার	৮ অংশ	পশ্চাতে
ব্রহ্মগুপ্তমতে	মঘানক্ষত্রের	আদিবিন্দু	মঘাতারার	৯ অংশ	পশ্চাতে
সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে	মঘানক্ষত্রের	আদিবিন্দু	মঘাতারার	৯ অংশ	পশ্চাতে

সুতরাং মঘা নক্ষত্রের আদিবিন্দু পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ধ্রুবককাল হইতে ব্রহ্মগুপ্তের কালে ৩° অংশ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়াছিল। এইরূপে অশ্বিন্যাদি বা মেষাদিও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং এইরূপে রাশিনক্ষত্রের আদিবিন্দু পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়াই আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না। বিভিন্ন গ্রন্থের ধ্রুবকপরিমাণে ভ্রান্তিও আছে।

এক্ষণে আমরা অন্যবিধ উপায়ে মহাকবির কাল নিরূপণের চেষ্টা করিতেছি। কলির ৩৬০০ বৎসর গতে বা ৪২১ শককালে অয়নাংশ শূন্য ছিল। এই মত আমরা সমগ্র বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে পাইতেছি। এই সময়েই আর্য্যভট ২৩ বৎসর বয়সে জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। বঙ্গদেশীয় প্রত্যেক পঞ্জিকাতেই ৪২১ শককালে অয়নাংশ শূন্য ধরিয়াই বর্ত্তমান কালের অয়নাংশ গণিত হইয়া আসিতেছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি সমস্ত তথাকথিত আর্ষ জ্যোতিষগ্রন্থেরও এই মত। এই ৪২১ শকেই বাসন্ত

বিষুব এবং মেষাদি বা অশ্বিন্যাদি বিন্দু একই বিন্দু ছিল, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তবে বর্ত্তমানে অয়নাংশ প্রায় ২৩° কেন হয়, তাহার উত্তর এই,—

সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় বর্ষমান	...	...	=	৩৬৫.২৫৮৭৫ দিন।
প্রকৃত সায়ন বর্ষমান	...	...	=	৩৬৫.২৪২২০ দিন।
অন্তর	...	...	=	.০১৬৫৫ দিন।
এই .০১৬৫৫ দিনে রবিগতি	...	...	=	৫৮''.৭০৯ বিকলা।

সুতরাং ৫৮''.৭০৯ বিকলাই আমাদের অয়নচলনের বার্ষিক মান।

অতএব ৪২১ হইতে ১৮৫৫ শককাল পর্য্যন্ত অয়নচলন = ২৩° ২৩′ ৭″ বিকলা। আর এক মতও আছে যে, ৪৪৪ শকেও অয়নাংশ শূন্য ছিল। এই দুই সময়ের অন্তর মাত্র ২৩ বৎসর। সুতরাং এক্ষণে যে প্রায় ২৩ অংশ অয়নচলন পাওয়া যাইতেছে, তাহার কারণ, আমাদের ভ্রান্ত বর্ষমান-জনিতই বটে। আমাদের বর্ত্তমানের হিসাবে ৬১১/৩ বৎসরে অয়নগতি ১° ধরা উচিত।

আমাদের জ্যোতিষীরাও প্রায় এইরূপই ফল অয়নবেগ সম্বন্ধে পাইয়াছিলেন। আর্য্যভট (৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) ও ব্রহ্মগুপ্তের (৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) মধ্যবর্ত্তী কালে বিষ্ণুচন্দ্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, অয়নবেগ প্রতি বর্ষে ৫৬''.৮৩২ বিকলা; মঞ্জুল বা মুঞ্জাল (৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ৫৯''.৮৯৮ বিকলা বা ১ কলা; সূর্য্যদেব যজ্বা ৫৯''.৫০৪ বিকলা; ভাস্কর (১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) মঞ্জুলের মতই সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল জ্যোতিষী প্রায় ৬০ বৎসরেই ১° অয়নচলন-কাল ধরিয়াছেন। আমাদের ১ অংশ অয়নচলনকালেরই প্রয়োজন; সুতরাং ৬১ বৎসর ১ অংশ অয়নগতি ধরিলেও বিশেষ কোনও ভ্রমের সম্ভাবনা নাই।

এইরূপে আমাদের মতে কালিদাসের কাল ৪২১ শক হইতে ৬১ বৎসরের পরবর্ত্তী ৪৮২ শককাল বা ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেছে। মহাকবির কাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগেই আসিয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপেই আমরা একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। ইহা ছাড়া কালিদাসের কাব্যে অয়নান্তের অন্যরূপ সূচনা পাইতেছি। তাহা বিবৃত করিয়া, পুনরায় কাল গণনা করা যাইতেছে।

৫। কালিদাসের সময়ের উত্তরায়ণান্ত বিন্দু

আমরা রঘুবংশের ১৮শ সর্গ, ৬ষ্ঠ শ্লোকে পাইতেছি যে,—

নভশ্চরৈর্গীতযশাঃ স লেভে নভস্তলশ্যামতনুং তনূজম্।
খ্যাতং নভঃশব্দময়েন নাম্না কান্তং নভোমাসমিব প্রজানাম্ ॥৬॥

"গন্ধর্ব্বাদিকর্ত্তৃক গীতযশাঃ সেই নৃপতি নল, নভস্তলের ন্যায় শ্যামবর্ণ নভঃ নামক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই পুত্র প্রজাদিগের নিকট নভোমাস বা শ্রাবণ মাসের ন্যায় প্রিয় হইয়াছিল।"

এখানে আমরা পাইতেছি যে, শ্রাবণ মাস মহাকবির প্রিয় মাস, এই মাসেই মেঘাগম পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে এবং এই মাসের হৃদয়গ্রাহিতার অন্য সকল কারণ কবি, মেঘদূত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার এই রঘুবংশেরই ১১শ সর্গ, ৩৬ শ্লোকে আছে,—

তৌ বিদেহনগরীনিবাসিনাং গাং গতাবিব দিবঃ পুনর্বসূ।
মন্যতেস্ম পিবতাং বিলোচনৈঃ পক্ষ্মপাতমপি বঞ্চনাং মনঃ ॥৩৬॥

"বিদেহনগরবাসিগণ আকাশ হইতে পৃথিবীতে সমাগত পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের দুইটী তারার ন্যায় প্রিয়দর্শন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে চক্ষুদ্বারা পানকালে পক্ষ্মপাতকালও অসহনীয় বিবেচনা করিতেছিল।"

এখানে কবি, পুনর্ব্বসুর দুইটী তারা অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বলিয়া কেন উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ আমরা এই বুঝিতেছি যে, সূর্য্য ঐ দুই তারার সন্নিহিত হইলে নভোমাস বা সৌর শ্রাবণারম্ভ হইত এবং কবির নিকট উহা অতীব প্রিয় মাস। আমরা বুঝিতেছি যে, উত্তরায়ণান্ত এই দুই তারার নিকটেই ছিল। হিন্দু জ্যোতিষী এবং সিদ্ধান্তকর্ত্তাদের মতে পুনর্ব্বসু যোগতারা (Pollux)-এর ধ্রুবক—

পঞ্চসিদ্ধান্তিকা মতে	...	...	৮৮° অংশ।
আর্য্যভট মতে	...	...	৯২° অংশ।
ব্রহ্মগুপ্ত মতে	...	...	৯৩° অংশ।
আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে	...	...	৯৩° অংশ।

ইংরাজী ১৯০৮ সনে এই পুনর্ব্বসুর দুইটী তারার (Castor and Pollux) স্ফুট ছিল যথাক্রমে ১০৯°১৪′২৪″ এবং ১১১°৪৭′২২″। উভয়ের স্ফুটান্তর প্রায় ২°৩০′। আর্য্যভটমতে Pollux-এর ধ্রুবক ৯২° বলিয়া তাঁহার অয়নান্ত Castor তারার অর্দ্ধ অংশ পূর্ব্বে ছিল। এখানেও মহাকবির সময়ের অয়নান্তবিন্দুর স্পষ্ট সূচনা পাওয়া গেল না। যে সময়ে অয়নান্ত Pollux-এর উপর দিয়া ছিল, তাহার কাল ৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দ, যে সময়ে উহা Castor তারাগামী ছিল, তাহার কাল ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দ। আর্য্যভটমতে পুনর্ব্বসুর শেষ পাদারম্ভ, পুনর্ব্বসুযোগতারার ২ অংশ পশ্চাতে, তাহা হইতে কাল গণনা করিলে আর্য্যভটের সময় ৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হয়। আমরা জানি যে, আর্য্যভটের সময় ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। এখানে গণনার এবং জ্ঞাত ফলের অনৈক্য নাই। মহাকবির সময় যে আমরা ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছি, তাহাই ঠিক্ বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে কালিদাসের অয়নান্তরেখা Castor তারার প্রায় অর্দ্ধ অংশ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ছিল। উভয় তারাই অয়নান্তের সন্নিহিত বুঝায়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কালিদাসের কালের অয়নান্ত পুনর্ব্বসুর দুইটী তারার মধ্যবর্ত্তী কেন ধরা হইবে না। তাহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান সংস্কৃত রামায়ণে উত্তরায়ণান্ত বিন্দু সম্বন্ধে এই সূচনা পাইতেছি যে, উহা পুনর্ব্বসুর দুইটী তারার মধ্যবর্ত্তী ছিল, তাহার কাল ৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। আমরা কালিদাসকে রামায়ণের বর্ত্তমান সংস্কর্ত্তার প্রায় এক শত বৎসরের পরবর্ত্তী বলিয়াই বিশ্বাস করি। এ বিষয়ে আমাদের Date of

"Composition" of the Ramayana নামক প্রবন্ধ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters, Vol. XIX-এ দ্রষ্টব্য[১]।

আমরা আর এক স্থলে মহাকবির কালের অয়নান্তবিন্দুর স্থির নির্দ্দেশই পাইতেছি। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কাল অনেক পরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। শ্লোকটী এই,—

> অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাৎ সমীপং দিগুত্তরা ভাস্বতি সন্নিবৃত্তে।
> আনন্দশীতামিব বাষ্পবৃষ্টিং হিমস্রুতিং হৈমবতীং সসর্জ্জ ॥ ৪৪ ॥ রঘুবংশ, ১৬শ সর্গ, ৪৪ শ্লোক।

"সূর্য্য অগস্ত্যের চিহ্ন অয়নান্তবিন্দুর নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলে উত্তরদিক্ আনন্দশীতপ্রদ বাষ্পবৃষ্টির ন্যায় হিমালয়সম্ভূত হিমস্রাব সৃষ্টি করিল।"

কবির অভিপ্রায় এই যে, গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইবামাত্র হিমালয়ের তুষার গলিতে আরম্ভ হইল এবং তুষারখণ্ড ও শীতল জল নদী দিয়া বহিতে লাগিল। গ্রীষ্মকালের আরম্ভ *হইলে উত্তরায়ণের ⅓ অংশ অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ সূর্য্য তখন উত্তরায়ণান্তবিন্দু হইতে ৬০° অংশ* দূরে থাকে। আমরা "অগস্ত্যচিহ্ন" শব্দদ্বারা অগস্ত্যের ক্রান্তিবৃত্তীয় স্থান বুঝিতেছি। বরাহমিহির তাঁহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় অগস্ত্যের স্থান "কর্কটাদ্য" বলিয়া সূচনা করিয়াছেন[২] এবং আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তেও আছে, "অগস্ত্যো মিথুনান্তগঃ[৩]"; সুতরাং অগস্ত্যচিহ্ন অয়ন দ্বারা উত্তরায়ণান্তবিন্দু বুঝাইতেছে। অর্থাৎ মহাকবি বলিতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহার কালের অয়নান্তরেখা অগস্ত্যগামী ছিল[৪]।

অপর পক্ষে আমরা অগস্ত্যগামী উত্তরায়ণান্ত রেখা ধরিয়া যদি মহাকবির কাল গণনা করি, তাহা ঠিক্ হইবে না। এখন (১৩৩১ সন) অগস্ত্যের স্ফুট ১০৪°০´ কলা; সুতরাং অয়নচলন মাত্র ১৪°০´ কলা হয় এবং সময় প্রায় ৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ আইসে। আমরা বুঝিতেছি, বরাহ এবং মহাকবি একই ব্যক্তি বা গ্রন্থ হইতে 'অগস্ত্যের স্থান মিথুন রাশির শেষ বিন্দুতে' ইহা শিখিয়াছিলেন অথবা বরাহের প্রতি আস্থাবান্ হইয়া কবি এ কথা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগস্ত্যতারা এত দক্ষিণে অবস্থিত যে, উহার ধ্রুবক পরিমাণ করিতে বরাহের ভ্রান্তি হওয়া

১। অশ্বঘোষের সময়েও রামায়ণ ছিল, তাহা তৎপ্রণীত বুদ্ধচরিত পাঠে সহজেই জানা যায়। অশ্বঘোষেরই সমসাময়িক কাত্যায়নীপুত্রকৃত জ্ঞানপ্রস্থানসূত্রের মহাবিভাষা নামক ভাষ্যে রামায়ণের নামোল্লেখ আছে। এ বিষয়ে Watanabe কৃত J. R. A. S. এর ১৯০৭ সনের সপ্তম প্রবন্ধ, ৯৯পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সেখানে আমরা জানিতে পারি যে, তখনকার রামায়ণে ১২০০০ শ্লোক ছিল; তাহাতে মাত্র দুইটী বিষয় ছিল, (১) রাবণ বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়াছিল, (২) রাম সীতার উদ্ধারপূর্ব্বক দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। রামায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল ৮০০০ শ্লোক নিয়া, অশ্বঘোষের সময় উহাতে হইয়াছিল ১২০০০ শ্লোক, বর্ত্তমানে উহাতে প্রায় ২৪০০০ শ্লোক আছে। অশ্বঘোষ শকাব্দপ্রবর্ত্তক কনিষ্কের ধর্ম্মগুরু ছিলেন।

২। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১৪শ অধ্যায়, ৪০ শ্লোক।

৩। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ৮ম অধ্যায়, ১০ম শ্লোক।

৪। এস্থলে আমরা মল্লিনাথকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলাম; কারণ, তাঁহার ব্যাখ্যা জ্যোতিষশাস্ত্রবিরুদ্ধ। তিনি লক্ষণাদ্বারা "অগস্ত্যচিহ্ন অয়ন" দক্ষিণায়ন বুঝাইয়াছেন। এখানে প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণার আশ্রয় অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক।

বিচিত্র নহে ; কারণ, পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মগুপ্ত অগস্ত্যধ্রুবক ৮৭° অংশ লিখিয়া গিয়াছেন[৫]। অবশ্য ব্রহ্মগুপ্তের যে এ স্থলে ভ্রান্তি নাই, তাহা বলা যায় না। বরাহের ভ্রান্তি অধিক ছিল এবং ব্রহ্মগুপ্তের অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলিয়া অনুমান হয়। বরাহের অগস্ত্যধ্রুবক ব্রহ্মগুপ্তের অগস্ত্যধ্রুবক হইতে কম হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং এ স্থলে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, কবি বরাহের প্রতি আস্থাবান্ হইয়াই "অগস্ত্যচিহ্ন অয়ন" বাক্যদ্বারা উত্তরায়ণান্ত বিন্দু বুঝাইয়াছেন এবং তিনি ও বরাহমিহির সমসাময়িক। বরাহমিহিরও বলিয়াছেন, "সাম্প্রতময়নং পুনর্ব্বসুতঃ"[৬]। আমরা সব দিক্ বিবেচনাপূর্ব্বক মহাকবির কাল খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বটে, এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমরা তাঁহাকে আর্য্যভটের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী বলিয়াই বুঝিতেছি এবং তাঁহার কাল ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দেরই আসন্ন।

৬। মহাকবি কালিদাস ও গণক কালিদাস

কেহ কেহ মহাকবিকে ও গণক কালিদাসকে একই ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতে চাহেন। কিন্তু এই মত ভ্রান্ত বলিয়া সহজেই প্রমাণ করা যায়। এই গণক কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণ নামক একখানা ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থ আছে। তাহার শেষ অধ্যায়ে ইনি লিখিয়াছেন যে,—

বর্ষৈঃ সিন্ধুরদর্শনাম্বরগুণৈর্যাতে কলৌ সংমিতে।
মাসে মাধবসংজ্ঞিকে চ বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ ॥

তিনি নিজ গ্রন্থের ক্রিয়োপক্রম কলির ৩০৬৮ বর্ষ অতীত হইলে করিয়াছেন। ৩০৬৮ কলিবৎসর = ১১১ শকপূর্ব্বকাল = ৩৪ খ্রীষ্টপূর্ব্ব অব্দ। ইনি কি এতই প্রাচীন? ইঁহার অয়নাংশানয়ন সম্বন্ধে একটী সূত্র আছে। তাহা এই,—

শাকঃ শরাম্ভোধিযুগোনিতো হৃতো মানং খতর্কৈরয়নাংশকাঃ স্মৃতাঃ।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণ, ১ম অধ্যায়, ১৯শ শ্লোক।

শকাব্দ হইতে ৪৪৫ বাদ দিলে যাহা থাকিবে, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে অয়নাংশ হইবে। সুতরাং এই গণক ৪৪৫ শকের পূর্ব্বের ত কখনই নহেন, নিশ্চয়ই অনেক পরের হইবেন।

পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী এই কালিদাস গণকের ক্রান্তি-সাম্যানয়ন সূত্র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইনি কেশবার্কের সমসাময়িক ; উভয়েরই সময় ১১৬৪ শক বা ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দ।[৭]

ক্রান্তিসাম্যানয়নের সূত্রটী এই,—

ঐন্দ্রে ত্রিভাগে চ গতে ভবেত্তয়োঃ শেষে ধ্রুবেহপক্রমসাম্যসম্ভবঃ।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণ, ৪র্থ অধ্যায়, ৩০ শ্লোক।

৫। ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, ১০ম অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক।
৬। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ৩য় অধ্যায়, ২১ শ্লোক।
৭। গণকতরঙ্গিণী, ৪৬ পৃষ্ঠা।

ইন্দ্রযোগ ২৬শ যোগ এবং ধ্রুবযোগ ১২শ যোগ। অর্থ এই যে, "ইন্দ্রযোগের ⅙ অংশ গতে এবং ধ্রুবযোগের ⅙ অংশ থাকিতে সূর্য্য ও চন্দ্রের ক্রান্তিসাম্য হয়।"

যে সময়ে রবিচন্দ্রের স্ফুটযোগ ৮০০´ কলা পরিমিত বৃদ্ধিলাভ করে, তাহার নাম এক-যোগ কাল। আর্য্যভট লিখিয়াছেন, যে সময়ে রবিচন্দ্রযুতি ১৮০° অংশ বা ৩৬০° অংশ হইবে, তখন তাহাদের ক্রান্তিসাম্য হইবে[৮]। আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তেরও এই মত[৯]। বলা বাহুল্য যে, রবি ও চন্দ্রের স্ফুটান্তর ১৮০° বা ৩৬০° হইলেও একই প্রণালীতে ক্রান্তিসাম্য ধরা যায়; কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষে এই শেষোক্ত অবস্থানদ্বয়কে পূর্ণিমান্ত ও অমাবস্যান্ত কাল বলে। এ স্থলে অবশ্যই সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েরই ক্রান্তিবৃত্তে গতি ধরা হয়। সায়ন রবিচন্দ্রযুতি ১৮০° হওয়ার কালকে ব্যতিপাত কাল এবং সায়ন রবিচন্দ্রযুতি ৩৬০° হওয়ার কালকে বৈধৃতপাত কাল বলে।

মনে করা যাউক যে, এই গণকের কালে অয়নাংশ = অ°, এবং চ° = চন্দ্রস্ফুট, র° = রবিস্ফুট। সুতরাং ক্রান্তিসাম্যকালে—

$$অ^\circ + চ^\circ + অ^\circ + র^\circ = ১৮০^\circ \text{ বা } ৩৬০^\circ,$$

$$\text{বা } ২অ^\circ + চ^\circ + র^\circ = ১৮০^\circ \text{ বা } ৩৬০^\circ।$$

গ্রন্থে আছে যে, যখন—

$চ^\circ + র^\circ = ৮০০' \times ২৫⅙ \text{কলা} = ৩৩৭^\circ ৪৬' ৪০''$ তখন বৈধৃত ক্রান্তিসাম্য। সুতরাং $২অ^\circ + ৩৩৭^\circ ৪৬' ৪০'' = ৩৬০^\circ$

অতএব $অ = ১১^\circ ৬' ৪০''$ (ক)

আবার ইহাও লিখিত আছে যে, যখন—

$চ^\circ + র^\circ = ৮০০' \times ১১⅚ \text{ কলা} = ১৫৫^\circ ৩৪' ২০''$ তখন ব্যতিপাতক্রান্তিসাম্য।

$\therefore ২অ^\circ + ১৫৫^\circ ৩৪' ২০'' = ১৮০^\circ$

সুতরাং $অ^\circ = ১২^\circ ১২' ৫০''$ (খ)

এখানে (ক) ও (খ) এই দুই ফলের অনৈক্য হেতু আমরা মধ্যমমানে

$অ^\circ = ১১^\circ ৩৯' ৪৫''$ গ্রহণ করিলাম।

ভাস্করাচার্য্য ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১১ অয়নাংশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং এই গণক কালিদাস ভাস্করের ৪০ বৎসরের পরবর্ত্তী; অতএব ইঁহার কাল ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা মহামহোপাধ্যায় ৺ সুধাকর দ্বিবেদী কর্ত্তৃক অনুমিত কাল হইতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বের হইলেও বিশেষ বিভিন্ন নহে। অতএব এই জ্যোতির্ব্বিদাভরণের গণক কালিদাস কখনই মহাকবি কালিদাস নহেন। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় দ্বিবেদী লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"অয়মন্তিমাধ্যায়ো গ্রন্থকৃতা ভগবদ্বঞ্চনয়া স্বয়ং বিরচিতো বা কেনচিদিতিহাসানভিজ্ঞেন প্রক্ষিপ্ত ইতি নিঃসংশয়ময়নাংশক্রান্তিসাম্যসাধনৈগ্র ন্থেবৈবি ভাতি।"

৮। আর্য্যভটীয়, কালক্রিয়া, ৩য় শ্লোক।

৯। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ১১শ অধ্যায়, ১২ শ্লোক।

শেষ অধ্যায়ে আরও আছে যে, এই গণক কালিদাসই মালবেন্দ্র নৃপতি বিক্রমার্কের বন্ধু মহাকবি কালিদাস এবং রঘুবংশাদি কাব্যত্রয় ও জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। যদি কোনও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এই গ্রন্থের কথা বিশ্বাস করিয়া মহাকবির সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি যে এই জগদ্বঞ্চকের হস্তে প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই[১০]।

৭। মহাকবি কালিদাস ও জ্যোতিষী বরাহমিহির

আমরা গণনায় মহাকবির সময় ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছি। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বরাহমিহির এবং মহাকবি সমসাময়িক, তদ্বিষয়ে কিছু প্রমাণও পূর্ব্বে দিয়াছি। এ বিষয়ে কিম্বদন্তী আমাদের মত সমর্থন করিতেছে। আমরা আরও প্রমাণ এ বিষয়ে দেওয়া উচিত মনে করিতেছি। বরাহমিহির তাঁহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় আর্য্যভটের নামোল্লেখ করিয়াছেন[১১]। এবং ব্রহ্মগুপ্ত ৫৫০ শাকে বরাহমিহিরের নামোল্লেখ করিয়াছেন[১২]। আর্য্যভটের কাল ৪২১ শাক. ৪২১ শাক এবং ৫৫০ শাকের মধ্যবর্ত্তী কাল ৪৮৫ শাক বা ৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ বরাহমিহিরের কাল আইসে। আবার ব্রহ্মগুপ্ত-প্রণীত খণ্ডখাদ্যক নামক গ্রন্থের টীকাকার আমরাজ লিখিয়া গিয়াছেন যে, "নবাধিকপঞ্চশত-সংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যঃ দিবং গতঃ।"[১৩] ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বরাহ-মিহিরের ৫০৯ শাকে বা ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন হয়। তাঁহার মৃত্যুর অন্ততঃ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বলিয়া নিশ্চয়ই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দই বরাহের প্রসিদ্ধিলাভকাল। অতএব কালিদাস ও বরাহমিহির সম-সাময়িকই ছিলেন। বরাহের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় দুইটি করণাব্দ আছে—একটি ৪২৭ শককাল, অপরটী ২ শককাল। যখন দুইটী করণাব্দ আছে, তখন এতদুভয়ের একটীও বরাহের কাল নহে। ৪২৭ শককাল রোমকসিদ্ধান্তের করণাব্দ। রোমকসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাতা ছিলেন লাটদেব; ইনি আবার আর্য্যভটের প্রথম শিষ্য। আর্য্যভটের করণাব্দ ৪২১ শককাল; সুতরাং ৪২৭ শককালকে লাটদেবের করণাব্দ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। লাটদেবও "সর্ব্বসিদ্ধান্তগুরু" এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। অতএব বরাহের কাল নিঃসন্দিগ্ধরূপে ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং ইহাই মহাকবি কালিদাসেরও কাল পাওয়া গিয়াছে।

এইরূপে আমরা মেঘাগম সম্বন্ধে কবিপ্রসিদ্ধি এবং মহাকবির নানাপ্রকার জ্যোতিষিক উক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক গণনাদ্বারা কালিদাসের কাল ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ, এই সিদ্ধান্তে আসিয়া

১০। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের কৃত "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" গ্রন্থের ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

১১। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১৫শ অধ্যায়, ২০ শ্লোক।

১২। ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, গোলাধ্যায়, ৩৯ শ্লোক।

১৩। পণ্ডিত শ্রীবাবুআজী মিশ্র সম্পাদিত খণ্ডখাদ্যক, ১০৯ পৃষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পৌঁছিয়াছি। তিনি যে বরাহমিহিরের সমসাময়িক, তাহাও প্রমাণিত করিয়াছি। ঐতিহাসিক যুক্তি এবং শিলালিপি দ্বারা প্রাপ্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে মতও আমাদিগের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

মাঘমণ্ডল ব্রত*

(১)

১৩৪০ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী "সূর্যের নূতন পাঁচালী" নামে ফরিদপুরের মাঘমণ্ডল ব্রতের বিবরণ দিয়াছেন। আমি ব্রতের গানটী পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি, সংগ্রহ জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়াছি। হিন্দুর বার মাসে তের পার্বণ ছিল, বালিকাদেরও ব্রত নিয়ম ছিল, এখন সে সব উৎসবের ও ব্রতের দিন চলিয়া যাইতেছে। পূর্ববঙ্গে কিছু আছে, পশ্চিমবঙ্গে পুরাবৃত্তের বিষয় হইয়াছে।

মাঘমণ্ডল ব্রত, মাঘ মাসের সূর্যব্রত। 'মণ্ডল' অর্থে বিম্ব, এখানে সূর্য বিম্ব। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী এই ব্রতের আনুপূর্বিক বিবরণ দিলে ব্রতকালের হেতু স্পষ্ট হইত। ছড়াটির এক স্থানে খণ্ডিত। অনুমান হয়, এই ব্রতের স্থান পাঁচ বৎসর যাবৎ পৃথক্ রাখা হইত। সে স্থানে প্রথম বর্ষে একটি বৃত্ত উৎকীর্ণ করিয়া, বৃত্তের বাহিরে সূর্যের উপরে ও নীচে কলাচন্দ্রের চিত্র অঙ্কিত হইত †। পঞ্চম বর্ষে ব্রত সমাপ্ত হয়। প্রতি বর্ষে মাঘ মাসের প্রত্যহ প্রাতঃকালে 'বারৈল' ভাসান হয় এবং বৃত্তের উপর ফুল ছড়াইয়া পূজা করা হয়।

এখন প্রশ্ন, সূর্যব্রতে বৃত্ত কেন, পাঁচ বৎসরে পাঁচটি কেন, চন্দ্র কেন, ব্রতের আরম্ভ ১লা মাঘ কেন? আমাদের যাবতীয় দেব-দেবীর পূজা ও ব্রত এক এক বিশেষ দিনে করা হইয়া থাকে। সে সে দিনকে বিশেষ করিবার হেতুচিন্তাদ্বারা পূজা ও ব্রতের আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। একটা উদাহরণ দিই। পশ্চিমবঙ্গে মাঘমণ্ডল ব্রত নাই। তৎপরিবর্তে বালিকারা অগ্রহায়ণ মাসে ইতু পূজা করে। এই পূজাও সূর্যপূজা; বাঁকুড়ায় নাম ই-অ-ত্তি। কলিকাতায় বর্ষীয়সীদের মুখেও এই নাম। বোধ হয়, মি-ত্র নামের বিকার। যেমন স-ন্ধ্যা-ব্র-ত হইতে সেঁ-জ-তি। মিত্র এক আদিত্য। বেদে মিত্রাবরুণ দুই আদিত্য। পুরাণে মিত্র জ্যৈষ্ঠ মাসের, বরুণ আষাঢ় মাসের আদিত্য। চন্দ্রসম্বন্ধী বলিয়া, কি অন্য কোন কারণে ঠিক বলিতে পারা যায় না, কালক্রমে মিত্র অগ্রহায়ণ মাসের আদিত্য গণ্য হইয়াছিলেন। প্রমাণ, মিত্রসপ্তমী—চান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের

---

* ১৩৪১। ৫ই ফাল্গুন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট জানিলাম, ঘরের উঠানে বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন স্থানে চিত্র অঙ্কিত করিতে বাধা নাই। আমার বোধ হয়, পূর্বকালে একই স্থানে পাঁচ বর্ষ যাবৎ বৃত্ত রচনা ও পূজা করা হইত। নচেৎ পর পর পাঁচটা বৃত্তের অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়। বোধ হয়, গৃহকর্মের স্থানাভাব হেতু ব্রতের পূর্ণ অনুষ্ঠানে নূতন বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে।

শুক্লা সপ্তমী। এই তিথিতে একটা যুগ আরম্ভ হইত এবং মিত্র-পূজা করা হইত। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৯৯ অব্দে সে যুগের আরম্ভ হইয়াছিল।*

পাঁজিতে সে দিন এখনও স্মৃত হইতেছে। দিবসত্রয় পূজা লিখিত হইতেছে। সে পূজা আর প্রচলিত নাই। বালিকারা ইতু নামে সে পূজা করিতেছে। সমুদয় অগ্রহায়ণ মাসে পূজা কর্তব্য ছিল। এখন কার্তিকান্ত দিবসে ও অগ্রহায়ণ মাসের রবিবারে রবিবারে পূজা হইয়া থাকে।

মাঘমণ্ডল ব্রতেরও আরম্ভ বহু প্রাচীন, মিত্রপূজা অপেক্ষাও প্রাচীন। এক কালে রবির উত্তরায়ণ দিন হইতে নূতন বর্ষ গণিত হইত। চান্দ্র পৌষ গতে মাঘী শুক্লা প্রতিপৎ হইতে নববর্ষ। বৈদিক যজ্ঞের তিথিনির্ণয়ের নিমিত্ত এইরূপ পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল। পঞ্জিকা একটু স্থূল। কোন বর্ষে মাঘী শুক্লা প্রতিপদে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে পাঁচ বৎসর পরে ষষ্ঠ বর্ষে আবার সে তিথিতে উত্তরায়ণ ধরা হইত। এই কারণে পাঁচ বৎসরে এক যুগ গণা হইত।

মাঘমণ্ডল ব্রতে চান্দ্র মাস পরিবর্তে সৌর মাস ধরা হইয়াছে। কারণ, ১লা মাঘ শুক্লা প্রতিপৎ হইতে পারে। পাঁচটি বৃত্ত পাঁচটি বর্ষচক্র। প্রথম বর্ষে প্রতিপদে চন্দ্র ছিল। ব্রতের প্রথম বৃত্তে এক কলা চন্দ্রের চিত্র তাহার দ্যোতক। ব্রত আরম্ভের পূর্ব-দিন মকর-সংক্রান্তি, পিঠা পার্বণ। ক্ষেত্রের ধান্য গৃহগত হইয়াছে, লক্ষ্মী গৃহে বাঁধা হইয়াছেন। পরদিন বাহিরে ধান্যরূপা লক্ষ্মীর পূজা, সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ। সে দিন সূর্য দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উদিত হন। সে কোণে উড়িয়া রাজার দেশ। এক উড়িয়া রাজা ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দ শতকে পুরীর ২২ মাইল উত্তরে সাগরতটে কোণার্ক (কোণারক) মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

এইরূপ ইতিহাস দ্বারা কবিত্বের রস শুখাইয়া যায়। কবি নিশ্চয় কোন ব্রাহ্মণ-কুমারীর মাতা। তিনি কন্যাকে বালসূর্যের ন্যায় তেজস্বী, রূপবান, মনোহর পাত্রে সম্প্রদান আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ভাবী জামাতা অবশ্য বিত্তশালী হইবেন। কারণ, আমরা জানি, 'কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং', সূর্যই রূপ ও ধনের (ধান্যের) মূল। অতএব কুমারী সূর্যাইকে পতি কামনা করিতেছে। সে জানে, সূর্যাই উড়িয়া রাজার দুই ঝিয়ের দুর্লভ দীর্ঘ কেশ, সুন্দর বসন ও মল খাড়ু দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া দুটিকে বিবাহ করিয়াছেন। কন্যা সতাইকে সুন্দর বলিয়া বাঘের মুখে ফেলিতে চায়।

কুমারীর নাম গৌরা বা গৌরমণি। কারণ, সে বর্ণে গৌরী, বয়সেও গৌরী। সে মাঘ মাসের সূর্যের আরাধনা করিতেছে। এখন মাঘ গত, হলদিয়া পাখী ডালে ডালে বসিয়াছে, ফাল্গুন চৈত্রে 'গৃহস্থের খোকা হউক' ডাকিতে থাকিবে। কন্যার মাতা দরিদ্র, তিনি কন্যাকে মাত্র শাঁখা ও খাড়ু দিতে পারিবেন। কিন্তু জামাইকে কেবল ক্ষীরোদষীর ধুতি (কোঁচা) দেওয়া চলিবে না। গরদের উত্তরীয় সহ জোড় দিতে হইবে। দরিদ্র পানের সুগন্ধি কোথায় পাইবেন? পানে কেবল গুয়া, চুন ও খয়ের ('খড়')। কিন্তু সূর্যাইর বরে

* পাঁজিতে দেখিতেছি, পূর্ব দিবস গুহষষ্ঠী লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গুহষষ্ঠী কার্তিক মাসের শুক্লা ষষ্ঠী।

ব্রাহ্মণীর সোনার চতুর্বাটী ('চৌয়ারী') নির্মিত হইবে, কন্যার নিমিত্ত সেরে সেরে সোণা আসিবে, কামার (স্বর্ণকার) গয়না গড়িয়া দিবে।

কন্যার দেশ নদীবহুল। সে দেশে নিম্নভূমি আছে, জাঙ্গালে যাতায়াত করিতে হয়, কোথাও বা নালার উপরে কাঠ ('চন্দন গাছ') ফেলিয়া পথ করিতে হয়।

ছড়াটি পূর্বকালে রচিত। তখন কড়ি দিয়া কেনা বেচা হইত ('কড়িয়া জাঙ্গাল')। গরদের প্রাচীন নাম ক্ষীরোদরী প্রচলিত ছিল। যে কৃমির উদরে ক্ষীর আছে, সে ক্ষীরোদর, তজ্জাত ক্ষীরোদরী, কৃমিজ বস্ত্র। ওড়িষ্যায় এই নাম এখনও আছে। ওড়িষ্যার 'খাড়ু'ও পাইতেছি। ওড়িয়া খাড়ু চক্রাকার, চেপ্টা। 'আম কাঁঠালিয়া পীড়িখানি ঘৃতে ম ম করে' কাঁঠাল কাঠের পীড়ি প্রসিদ্ধ, কিন্তু কেহ আম কাঠের পীড়ি করে না। কারণ, আমের পাটা মসৃণ হয় না। সে পাটা জলে বাঁকিয়া যায়, পচিয়া যায়। এখানে আম শব্দের অর্থ হীন সহচর। কাঁঠালের পীড়িখানি নূতন। এই হেতু তাহা ঘৃতলিপ্ত করা হইয়াছে, সেটা ঘৃতে মহ-মহ করিতেছে, ঘৃতগন্ধি হইয়াছে। সংস্কৃত 'মহ' শব্দে উৎসব, যজ্ঞ, তেজস্। ওড়িয়াতে মহ-মহ শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত আছে।*

'বারৈল' কি বার-পতি? ফরিদপুরে গাং শব্দটি কি 'গাঙ্' লেখা হয়? শ্রীযুত চক্রবর্তী কতকগুলি শব্দের টীকা করেন নাই। করিলে ছড়াটি সম্পূর্ণ বোধগম্য হইত। কালে কালে পুরাতন ছড়ায় কিছু কিছু নূতন শব্দ যুক্ত হইয়াছে, ইংরেজ আমলের 'বাকৃষ' জুটিয়াছে

ছড়াটির উপরে উপরে হাস্য কৌতুক, কিন্তু ভিতরে কন্যার বিবাহের নিমিত্ত দরিদ্র মাতার আকুলতা ও উদ্বেগ বর্ণে বর্ণে ব্যক্ত হইয়াছে। ধন্য কবি, যিনি দুই একটা শব্দে গ্রামের ও সংসারের হৃদয়গ্রাহী চিত্র লিখিয়াছেন, বিবাহ-বাসরের হর্ষ ও মেলানির বিষাদ যেন প্রত্যক্ষ হইতেছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

---

* পাবনার বালিকাদের 'ইটা পুকুর' (ইষ্ট যজ্ঞীয় পুষ্করিণী) ব্রতে অনুরূপ ছড়া আছে,—

আম কাঁঠালিয়া পীড়িখানি ঘৃতে ম-ম করে।

তার উপরে বাপ খুড়ায় কন্যাদান করে॥

(২)

১৩৪০ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সূর্য্য সম্বন্ধে যে এক অল্পজ্ঞাত উপাখ্যানের পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের ন্যায় মনীষীর চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আমার প্রবন্ধে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছিলাম যে, সম্পূর্ণ উপাখ্যান আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই—উহার অংশ-বিশেষ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। উপাখ্যান সম্বন্ধে কোনও পুথি এযাবৎ আবিষ্কৃত না হওয়ায়, মুখে মুখে প্রচলিত এই উপাখ্যান সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করা কঠিন। যখন যেটুকু সংগৃহীত হইল, সেইটুকু লিখিয়া রাখা ছাড়া উপায় নাই। তাই পূর্ব্বপ্রবন্ধ প্রকাশকালে অজ্ঞাত এবং পরবর্ত্তী কালে প্রাপ্ত এই উপাখ্যানের কয়েকটী বিচ্ছিন্ন অংশ এই স্থানে প্রকাশিত হইতেছে। মুখে মুখে প্রচলিত এই উপাখ্যানের বিভিন্ন অংশের পৌর্বাপর্য্য নিরূপণ করাও সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে বিভিন্ন ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌরীর জন্ম ও পরিচয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি কয়টী পাওয়া গিয়াছে। এগুলি প্রবন্ধের ৭ম পৃষ্ঠায় 'সূর্য্যের পূর্ব্বরাগ' অংশের অব্যবহিত পূর্ব্বে সংযোজিত হইতে পারে।

[গৌরীর পরিচয়]

যখনে জন্মিলেন গৌরী বিদর্ভনগরে।
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
এই কন্যা বিয়া করবে সূর্য্য দিবাকর রে।
দিনে দিনে হইল কন্যা দশম বৎসর রে॥
সোনার কলসী লইয়া জল ভরিতে যায় রে।

সূর্য্যঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন—

কোথা হইতে আইচ্ছ কন্যা কোথায় তোমার ঘর রে।
কাহার কন্যা তুমি কি বা তোমার নাম রে॥
কিসের কলসী তোমার কক্ষের উপর রে।

গৌরী উত্তর দিলেন—

বিদর্ভেতে জন্ম আমার মথুরাতে ঘর।
উড়িয়া রাজার কন্যা আমি গৌরামালা নাম॥
সুবর্ণের কলসী আমার কক্ষের উপর।

প্রবন্ধের অষ্টম পৃষ্ঠায় 'সূর্য্যের স্বপ্ন দেখান' শীর্ষক অংশের পর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি কয়টী পাওয়া গিয়াছে।

[স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন]

ব্রাহ্মণে উঠিয়া বলে ব্রাহ্মণীর স্থানে।
কি স্বপ্ন দেখিলাম আমি আজিকার রাত্রে॥

আমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা সতী।
তাহার মনে বড় ইচ্ছা সূর্য্যাইরে পাবে পতি ॥
আমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা নাম।
শঙ্খ বস্ত্র দিয়া কন্যা সূর্য্যাইরে কর্‌ছি দান ॥

সূর্য্যের গৃহে প্রত্যাগমন প্রস্তাবের পর (পৃঃ ১১) গৌরীর মাতা পতিগৃহের ঐশ্বর্য্যের ইঙ্গিত করিয়া গৌরীকে যে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি কয়টী পাওয়া গিয়াছে।

[গৌরীর প্রতি মায়ের প্রবোধ]

আজ যাও গৌরী লো কাঁদিয়া কাটিয়া।
কাল আসিও গৌরী লো হাসিয়া রসিয়া ॥
আজ যাও গৌরী লো ত্যানা-তোনা[১] পড়িয়া।
কাল আসিও গৌরী লো চেলির সাড়ী পড়িয়া ॥

উপাখ্যানের মধ্যে এমন কতকগুলি ছড়াও গান করা হয়, যেগুলির সহিত মূল উপাখ্যানের সাক্ষাৎসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সমস্ত ছড়া পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি নাই। সম্প্রতি পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত গবেশচন্দ্র দাস এইরূপ কতকগুলি ছড়া সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই ছড়াগুলির যে যে স্থলে আমাদের উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকার কোনও উল্লেখ আছে, সেইগুলি এই স্থানে উদ্ধৃত হইতেছে। সাধারণের সুবিধার জন্য, অংশগুলির বর্ণনীয় বিষয়ের ইঙ্গিত প্রতি অংশের উপরি ভাগে দেওয়া হইল এবং পাদটীকায় প্রাদেশিক দুরূহ শব্দগুলির অর্থ নির্দ্দেশ করা হইল।

এই ছড়াগুলিতে রাউলের বিবাহের পরবর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে—এই সকল ঘটনার কথা আমাদের প্রকাশিত উপাখ্যানে নাই। একটী ছড়ায় রাউলের ছোট ভাইয়ের নাম দেওয়া হইয়াছে 'শিবাই'।

[রাউলের বাড়ী বন্ধক দেওয়া]

হাড়ি পাতিল ঠুকুর ঠুকুর কলসের কান্দা[২]।
আজগা লাউলে গো[৩] বড় বাড়ী বান্দা[৪] ॥
হাড়ি পাতিল ঠুকুর ঠুকুর কলসের কান্দা।
আজগা[৫] লাউলে গো ছোট বাড়ী বান্দা ॥
চল গো শত বইন্[৬] বেড়াইতে যাই।
লাউলে গো বড় বাড়ী মেলাইতে[৭] যাই ॥

১। ত্যানা-তোনা—ছেঁড়া কাপড়, ন্যাকড়া। ২। কান্দা—স্কন্ধ। ৩। লাউলে গো—রাউলদের। ৪। বান্দা—বন্ধক। ৫। আজগা—আজকে। ৬। বইন—ভগিনী। ৭। মেলাইতে—খালাস করিতে।

চল গো শত বইন বেড়াইতে যাই।
লাউলে গো ছোট বাড়ী মেলাইতে যাই ॥

[রাউলের স্ত্রীর গর্ভ]

আমের বউল[১] আইল বাড়ী বাড়ী।
লাউলের বউরে দেইল ঢাক্কাই শাড়ী ॥
লাউলের বউ লো সাধন্তী[২] কি কি খাইতে সাধ।
ইলিশ মাছ ভাজা পান্থা ভাত ॥[৩]

.. ..

তোমার লাউলে দিয়া পাঠাইছে ক্ষীরার রাইং[৪]।
ক্ষীরার রাইং না লো প্যাকের রাইং ॥
খাইস্ না ছুইস্ না শিয়রে থুইস্।
লাউল ঠাকুর বাড়া আইলে বিলাইয়া দিস্।

[রাউলের পুত্রোৎপত্তি]

লাউলে গো বাগানে কে রে কাটে পাত।
লাউলের ছোট ভাই শিবাই কাটে পাত ॥
না কাটিও শিবাই রে না কাটিও পাত।
আমরা শত বইন কাটিব পাত ॥
পাত কাইটা ভাত খাইমু।
ভাত খাইয়া ঝিকটি খেলাইমু ॥
ঝিকটি খেলাইয়া লো শুখাই লো দূত।
কি দিয়া পূজুম লো লাউলের ঘরের পুত ॥
লাউলের ঘরে পোলা অইছে, কি কি নাম থুইমু।
আম গা[৫] হাতে দিয়া আমাই নাম থুইমু ॥
কলা গা হাতে দিয়া······· কলাই··········.. ।
বেল ....বেলাই·· ······ ॥

[প্রবাস হইতে রাউলের প্রত্যাগমন]

কি করুছ লো লাউলের বউ দুয়রে বইসা।
তোর রাউলে আইছে দোলায় চইড়া ॥

১। বউল—মুকুল। ২। সাধন্তী—প্রাপ্তদোহদা, গর্ভবতী। ৩। ইহার পরে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়। ৪। রাইং—হাঁড়ী জাতীয় পাত্রবিশেষ। ক্ষীরার রাইং—ক্ষীরভরা পাত্র। ৫। আমগা—আমটী।

আস্‌বেন লাউলে বসবেন খাটে।
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে॥
চুলগাছি মেইলা দিবেন চম্পার ডাইলে
কাপড়খান মেইলা দিবেন বড় ঘরের চালে॥

[রাউলের চরিত্র]

আলা চাউলে গামছাত্থে লাউলে স্নান করে।
ছাপাই বাড়ী কাপড় থুইয়া লাউলে শীতে মরে॥
আলা চাউলে গামছাত্থে লাউলে স্নান করে।
শ্বশুর বাড়ী মাউগ থুইয়া লাউলে ভাতে মরে॥
ও লাউল, ভাত খাও আইসা ঘরে।
তোমার শাশুরী রান্ধে বারে মট্‌কার কদমগাছটির তলে॥
কদমের ডাইল ভাইঙ্গা পাছুর পড়ে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১৮৫৮—১৮৬৭

১

১৩৩৮ ও ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় আমি ছয়টি প্রবন্ধে ১৮১৮ হইতে ১৮৫৭ সন পর্য্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত বাংলা সাময়িক পত্রের পরিচয় দিয়াছি।* এইবার ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৭ সন পর্য্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকাগুলির বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু এই দশ বৎসরের মধ্যে যে-সকল বাংলা সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হয়, তাহাদের নামধাম সংগ্রহ করা মোটেই সুসাধ্য নহে। এগুলির অধিকাংশই হয় অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা প্রাচীন পরিবারের কাগজপত্রের মধ্যে অনাদৃতভাবে পড়িয়া আছে; কতক-গুলি আবার এদেশ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়া বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছে। দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের পর আমি এই যুগের বাংলা সাময়িক পত্র সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম। আমার এই বিবরণে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, হয়ত কোন কোন সাময়িক পত্রের নাম একেবারে বাদ পড়িয়াছে। কেহ এরূপ ত্রুটি দেখাইয়া দিলে অনুগৃহীত হইব।

সংবাদপত্র

কলিকাতা বার্ত্তাবহ

১৮৫৮ সনের ১৮ই জানুয়ারি এই সমাচার পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১লা বৈশাখ ১২৬৫ (১৩ এপ্রিল ১৮৫৮) সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ,—

---

* এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার পর নূতন অনুসন্ধানে আরও দুইখানি সাময়িক পত্রের নাম জানিতে পারিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি:—

১। দলবৃত্তান্ত।—১৮৩২ সনের প্রথম ভাগে ইহার আবির্ভাব হয়। খুব সম্ভব ইহা সাপ্তাহিক পত্র ছিল। সামাজিক দলাদলির সংবাদই 'দলবৃত্তান্তে' প্রকাশিত হইত। ১৮৩২ সনের ২১এ জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদকের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হয়, তাহাতে 'দলবৃত্তান্ত'-প্রকাশের উল্লেখ আছে। মন্তব্যটি এইরূপ:—

"...অপর দল বৃত্তান্তনামক এক পত্র প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাতেই দলের কথা সকলি লেখা আছে,...।"

১৮৩২ সনের গোড়ায় যে 'দলবৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসেও যে কাগজখানি বাহির হয় নাই, তাহার উল্লেখ 'সমাচার দর্পণে' পাইয়াছি।

২। উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা।—১৮৫৭ সনের জানুয়ারি মাস হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি উত্তরপাড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক পত্র' লেখেন:—

"উত্তরপাড়া নিবাসী বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমাদিগের দর্শনার্থ 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকার' প্রথম সংখ্যা হইতে চতুর্দ্দশ সংখ্যা পর্য্যন্ত...প্রেরণ করিয়াছেন। উপনগর বা ভদ্র গ্রাম বিশেষের অবস্থা বিবৃত পত্রিকা বা পুস্তিকা যত প্রচার হয় ততই আহ্লাদের বিষয়,...।"

"সন ১২৬৪ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।—......৬ মাঘ দিবসে 'কলিকাতাবার্ত্তাবহ' নামে এক খানি নূতন সমাচার পত্র প্রকাশ হয়।"

'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' সাপ্তাহিক পত্র ছিল বলিয়াই মনে হয়।

বিচারক

১৮৫৮ সনের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ১লা চৈত্র ১২৬৪ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ,—

"১২৬৪, ফাল্গুন মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ।...'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হয়।"

এই পত্রিকাখানি বাহির করেন—আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

" 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'...গ্রন্থখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন উহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না।...উহা আমারই রচনা।...ঐ গ্রন্থ সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০০-০১)

চমৎকারমোহন

'চমৎকারমোহন' নামে একখানি সমাচার পত্র ১৮৫৮ সনের আগষ্ট (শ্রাবণ ১২৬৫) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বিভাষিক ছিল; ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রতি-সপ্তাহে তিনবার—সোম, বৃহস্পতি ও শনি বার—প্রকাশিত হইত। কলিকাতা চোরবাগানে শ্রীশ্রীকান্ত শর্ম্মার দ্বারা চমৎকারমোহন যন্ত্রে এই পত্রখানি মুদ্রিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন—'প্রিয়ম্বদ' (১৮৫৫ সন) ও 'নলিনীকান্ত' (১৮৫৯ সন) উপন্যাস-প্রণেতা কেদারনাথ দত্ত।

'চমৎকারমোহন' পত্রের চতুর্থ সংখ্যার তারিখ—১৬ই আগষ্ট ১৮৫৮ (১ ভাদ্র ১২৬৫)।

'চমৎকারমোহন' পত্রের ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম:— ৪-৬, ৮, ১০-১১, ১৩-১৪, ১৭, ২২, ২৫-২৮, ৩১-৩২ ও ৪৭শ সংখ্যা। ডক্টর শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত এই সকল সংখ্যা হইতে কিছু কিছু তথ্য সঙ্কলন করিয়া 'ভারতবর্ষে' (আশ্বিন ১৩৩৯) প্রকাশ করিয়াছেন।

সোমপ্রকাশ

'সোমপ্রকাশ' একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ১৮৫৮ সনের ১৫ই নবেম্বর (১ ফাল্গুন ১২৬৫) সোমবার ইহার প্রথম আবির্ভাব। 'সোমপ্রকাশে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত :—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

'সোমপ্রকাশ' প্রথমে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত; প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকিত :—

> "কলিকাতা। চাঁপাতলা এমহরেষ্ট ষ্ট্রীট সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেন ১ নং বাটীতে বাঙ্গলা যন্ত্রে প্রতি সোমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।"

পরে মাতলা রেল খোলা হইলে 'সোমপ্রকাশ' চাংড়িপোতা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৬২ সনের এপ্রিল মাসে "এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতে প্রকাশিত হয়।" ('সোমপ্রকাশ,' ২১ ও ২৮ এপ্রিল ১৮৬২)

'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। রীতিমত রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা 'সোমপ্রকাশে'ই প্রথম সুরু হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

১৮৬৫ সনের গোড়ায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদকীয় আসন হইতে অবসরগ্রহণ করেন। ১৮৬৫, ৯ই জানুয়ারি তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশ :—

> *The Week.*—Tuesday, 3 Jany. We are sorry to read a notice in the *Shome Prokash* announcing the withdrawal of Pundit Dwarkanauth Vidyabhoosun from the editorial chair of that paper. The *Shome Prokash* was first projected by Pundit Eswar Chunder Vidyasaghur, and we believe the first number was written by him. But he fell sick and made over the paper to Pundit Dwarkanauth, under whose able management the paper attained the foremost place among the Bengalee newspapers. In fact the retiring editor of the *Shome Prokash* taught his native brethren of the journalism craft a new style of journalism. His loss to the cause of Indian advocacy will be very severely felt.

বিদ্যাভূষণ মহাশয় কি কারণে সম্পাদকতা ত্যাগ করেন তাহার সঠিক কারণ এখনও জানিতে পারি নাই। শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ 'সোমপ্রকাশ' পত্রের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করেন; ইহারই ফলে তিনি সম্পাদকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন—এরূপ কথাও তখন শোনা গিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ১৮৬৫ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' লিখিয়াছিলেন :—

SUMMARY OF NEWS.........—Malicious folks, writes a correspondent of the *Shomeprokash*, impute the retirement of the late worthy Editor of that paper from the ranks of journalism to the unfortunate circumstance of his having been involved in difficulties, brought on by the libel case of the Santipore Brahmo Samaj *vs* the *Shomeprokash*, in which the Editor was mulcted in damages. We have always had to admire the creditable and spirited management of the *Shomeprokash* under the old *rigime*, which decidedly infused a tone of improvement into the whole Vernacular Press and inaugurated a new era in its annals, but at the same time we have had to mourn the rather too free circulation the journal have to all sorts of scandals.

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পর সহকারী সম্পাদক বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদক হন। সম্পাদকরূপে তাঁহার নামের উল্লেখ তাঁহারই লেখা একখানি পত্রে পাইয়াছি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের ৭ম বার্ষিক অধিবেশন হয় ২৪এ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ সনে। এই অধিবেশনে বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি ইংরেজী পত্র পঠিত হয়। সেই পত্রের শেষে আছে :—

"Biprodass Banerjee, Editor Shome Prokash."

বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কত দিন সম্পাদকতা করিয়াছিলেন বলিতে পারিতেছি না। তবে কিছুদিন পরে আবার তাঁহাকে 'সোমপ্রকাশে'র সহকারী সম্পাদকরূপে দেখিতেছি। ১৮৭৩ সনের মাঝামাঝি বিপ্রদাস 'সহচর' পত্র প্রকাশ করিলে নবগোপাল মিত্র তাঁহার *National Paper* পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

Sahachar. Is a new Vernacular Paper, to be edited by Baboo Byprodas Banerjya, late sub Editor of *Som Prakash* is just out. The paper takes the motto we adopted some time ago in the Bengalee edition of our paper...(The *National Paper*, 18 June 1873.)

'সোমপ্রকাশ' পত্রের শেষ ইতিহাসটুকু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলিতেছি। তিনি 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে (পৃ. ২৮৯-৯০) লিখিয়াছেন :—

শেষ দশায় শারীরিক অস্বাস্থ্যনিবন্ধন তিনি [দ্বারকানাথ] সোমপ্রকাশ সম্পাদনে ততটা সময় দিতে পারিতেন না। এই সময়ে কিঁছুদিন স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে কাশীতে গিয়া বাস করেন।...তৎপরে দেশে ফিরিয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় সোমপ্রকাশের কার্য্য করিতে পারিতেন না।

ইহার উপরে ভার্নেকিউলার প্রেস আক্‌ট্ নামক আইন [১৮৭৮ সনে] বিধিবদ্ধ হইলে, অমৃত বাজার পত্রিকা যখন ইংরাজী কাগজে পরিণত হইল, তখন তিনি কিছুদিনের জন্য সোমপ্রকাশ

তুলিয়া দিলেন, তথাপি নবপ্রণীত অপমানকর আইনের অধীন হইতে পারিলেন না।...পরে ঐ গর্হিত আইন [১৮৮২ সনে] উঠিয়া গেলে সোমপ্রকাশ আবার বাহির হইল বটে কিন্তু পূর্ব্বপ্রভাব আর রহিল না। তাহাও ক্রমে হস্তান্তরে গেল। ইহার পরে তিনি 'কল্পদ্রুম' নামে এক মাসিক পত্রিকা কিছুদিন বাহির করিয়াছিলেন ;...। ১৮৮৬ সালের ২২শে আগষ্ট দিবসে [তিনি] গতাসু হন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশী গমন করিলে (১৮৭৪ সনের গোড়ায়) তাঁহার ভাগিনেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক মাস 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদন করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৮৭৪ সনের ২৭শে জুলাই পুনরায় 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

'সোমপ্রকাশ' পত্রের ফাইল।—

শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :— ৩য় ভাগ (১২৬৮)—২৮, ৩১, ৩৩-৩৫, ৪৬-৫০ম সংখ্যা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :— ৪র্থ ভাগ (১২৬৯)—২২-৫০শ সংখ্যা। ৫ম ভাগ (১২৬৯-৭০)। ৬ষ্ঠ ভাগ (১২৭০)—১-২১শ সংখ্যা।

বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরি, চাংড়িপোতা :—৪র্থ ভাগ, ২২-৫০ম সংখ্যা। ৫ম ভাগ, ১-২১শ সংখ্যা। ৯ম ভাগ, ১-২১শ সংখ্যা। ১০ম ভাগ, ২২শ সংখ্যা হইতে শেষ পর্য্যন্ত। ১১শ ভাগ, ১-২১শ সংখ্যা।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম (হেণ্ডন) :—১ম ভাগ, ৩৫-৩৮শ সংখ্যা। ২য় ভাগ, ৪০, ৪১-৫০ম সংখ্যা। ৩য় ভাগ, ১-১৪, ১৬-২৪, ৩৬-৩৮, ৪০, ৪৩-৪৬শ সংখ্যা। ৪র্থ ভাগ, ৭, ১১-১২, ১৫-১৮, ২৫, ২৬, ২৮শ সংখ্যা। ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। ডক্টর শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত এই সংখ্যাগুলি হইতে কিছু কিছু তথ্য সঙ্কলন করিয়া ১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছেন।

সৌদামনী

এই পত্রিকাখানি ১৮৫৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯ ভাদ্র ১২৬৬) প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা প্রতি-সপ্তাহে দুইবার—মঙ্গল ও শনি বার—বাহির হইত। শ্যামাচরণ সান্ন্যাল ও বিপিনবিহারী সরকার ইহার যুগ্ম-সম্পাদক। 'সৌদামনী' পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা পাইবার পর 'সংবাদ প্রভাকর' যে মন্তব্য করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"সৌদামনী নামে এক নবীনা পত্রিকা গত সপ্তাহাবধি এই রাজধানীতে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। আমরা তাহার প্রথম দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, যেরূপ সরল অথচ উৎকৃষ্ট মিষ্ট ভাষায় গদ্য পদ্য লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রশংসা করিতে হইবেক। শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ সান্ন্যাল, তথা শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী সরকার মহাশয় এই নবীনা পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছেন। ইহারা বড় অপরিচিত নহেন। ইহারদিগের বিরচিত অনেক উত্তম প্রবন্ধ এই প্রভাকরে ও নগরীয় অন্যান্য অনেক সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছে। অতএব ইহারদিগের দ্বারা সম্পাদকীয় কার্য্য যথা

নিয়মে নির্ব্বাহ হইতে পারে। অধুনা আমরা পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি, নবীনা সৌদামনী অম্বুদ বিহারিণী চঞ্চলার ন্যায় চঞ্চলা না হইয়া স্থিরভাবে অবনিবাসিনী হইয়া কবিতা প্রিয় পাঠার্থি বৃন্দের চিত্তোন্মাদিনী হউন।

সৌদামনী পত্রিকা প্রভাকরের ন্যায় এক তক্তা কাগজে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবারে প্রকাশ হইতেছে। মাসিক মূল্য আট আনামাত্র যাহার প্রয়োজন হয় সম্পাদকদিগের নামে পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।" ('সংবাদ প্রভাকর', ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯, শনিবার)

সংবাদ দ্বিজরাজ

'সংবাদ দ্বিজরাজ' একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ— ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ (৪ আশ্বিন ১২৬৬)। ইহা প্রতি-সোমবার প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইত। 'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন গোঁসাইদাস গুপ্ত। এই সাপ্তাহিক পত্রখানির কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

নাস্তং যাতারুণোদয়ে নচরুচিং ধত্তেরস্তাম্বরাথাম্লোল্লাসং
কুমুদীকরনা কুরুতে কলঙ্কানেবাঙ্কিতাঃ।
সম্পত্ত্যান্মদয়মনাংসি মহতাং ভাবান্ সমুম্ভাবয়ন্নুদগচ্ছন্
দ্বিজরাজ এষ নিতরামব্যাজ মুম্ভুাজতে॥

'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অভাব পূরণার্থই 'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের আবির্ভাব। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর দিন 'সংবাদ প্রভাকর' যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা গেল :—

"আমারদিগের যন্ত্রালয় হইতে গত দিবসাবধি সংবাদ দ্বিজরাজ নামে এক খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশারম্ভ হইয়াছে। আমারদিগের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ গোঁসাইদাস গুপ্ত তাহার সম্পাদক হইয়াছেন। এই ক্ষণে সময় বড় বিরুদ্ধ কোন প্রকার নূতন পত্র প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হওয়া অতি কঠিন বলিতে হইবেক। যাহা হউক আমরা পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি এই নবীন পত্র চিরস্থায়ী হউক। বিদ্যামোদি ব্যক্তিগণ আদর পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিয়া সম্পাদকের উৎসাহবর্দ্ধন করুন। যেরূপ প্রণালীক্রমে ও স্পষ্ট-ভাষায় দ্বিজরাজ পত্র লিখিত হইয়াছে তাহা কোনক্রমে মন্দ বলা যায় না। আমরা পাঠক মহাশয়দিগের পাঠার্থ প্রথম সম্পাদকীয় উক্তি নিম্ন ভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

'আমরা অবিচলিত ভক্তিভাবে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্ব বিঘ্নবিনাশক পরমেশ্বরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক এই অভিনব পত্র প্রকাশারম্ভ করিলাম। অধুনা আমরা কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে মানস করি না। কেবল এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি, যে স্বদেশের মঙ্গলবিধান করাই আমারদিগের প্রধান সঙ্কল্প,

এবং দেশীয় ব্যক্তিদিগের মনোরূপ ক্ষেত্র হইতে কুনীতিরূপ কণ্টকরাশি উন্মূলিত করিয়া সুনীতিরূপ সুন্দর বীজবপন করণে আমারদিগের যত্ন নিয়তই নিযুক্ত থাকিবেক।*

'সংবাদ প্রভাকর পত্রের অন্তর্গত যে প্রকার সাধুরঞ্জন পত্র ছিল এই দ্বিজরাজ পত্রও সেই প্রকার হইবেক। কিন্তু উহার সম্পাদকীয় কার্য্য প্রভাকর হইতে সম্যক্ প্রকারেই স্বতন্ত্র থাকিবেক। যে সকল মহাশয়েরা সাধুরঞ্জন পত্র গ্রহণ করিতেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দ্বিজরাজ পত্র গ্রহণ করিলে আমরা পরম বাধিত হইব। যে সকল বিষয় পাঠে তাঁহারদিগের সন্তোষ জন্মে, আমরা সেই সকল বিষয় স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া তাঁহারদিগের প্রীতিলাভে সাধ্য পর্য্যন্ত যত্ন করণে ত্রুটি করিব না।

'এই দ্বিজরাজ পত্র এই আকারে প্রতি সোমবার প্রকাশ হইবেক। মাসিক মূল্য ।০ আনা বার্ষিক অগ্রিম ২॥০ টাকা মাত্র।...' ”

'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—৫ম বর্ষের (১৮৬৩-৬৪) ২৩-২৫, ৩০-৪২ সংখ্যা।

পাক্ষিক ও মাসিক পত্র

সুবোধিনী

১৮৫৭ সনে চন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় বলিয়া পাদরী লং উল্লেখ করিয়াছেন।* কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে (পৃ. ৩৮৭-৪৮) 'সুবোধিনী'র প্রকাশকাল ১৮৫৭ সন বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকাখানি ১৮৫৮ সনের ১৩ই জানুয়ারি (১ মাঘ ১২৬৪) রামচন্দ্র দিচ্ছিতের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার কয়েক দিন পরে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' লিখিয়াছিলেন :—

“চুঁচুড়া নগরে প্রকাশিত সুবোধিনী নাম্নী এক পাক্ষিকী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইলাম, বর্ত্তমান মাঘ মাসের প্রথম দিবসে ইহার জন্ম হইয়াছে। সম্পাদকের নাম শ্রীরামচন্দ্র দিচ্ছিত। পত্রিকার মাসিক মূল্য ।০ আনা। প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয় বৃন্দ প্রকটিত হইয়াছে।

ঈশ্বর স্তোত্র
পত্রিকা প্রকাশের অভিপ্রায়
সত্য মায়তনং
নীতি সার

* Long's **Returns** etc. 1859, p. liii.

শান্তি শতক

গোলেস্তাঁর অনুবাদ।

ভারতবর্ষীয় কুটীর।

মানসের প্রতি হিতোপদেশ।

আমরা প্রার্থনা করি এবম্প্রকার পত্র নিকর বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে পদ্মবনবৎ প্রকাশিত হউক। পরন্তু সুবোধিনীর উচিত, জন্মভূমি চুঁচুড়া এবং তদন্তঃপাতি প্রদেশের সমাচার উপহার প্রদান পূর্ব্বক পাঠকগণকে পরিতৃপ্ত করেন, ইহাতে বিশেষ উপকার এই যে সংবাদ লিখনের অভ্যাস সুন্দররূপ হইলে তাঁহার ভাষার লালিত্য বৃদ্ধি সহ সাধারণের কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হইবেক।' (২২ জানুয়ারি ১৮৫৮)।

'সুবোধিনী' পত্রিকা সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"সুবোধিনীনামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র কলেজের অতি নিকটে চৌমাথা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক রামচন্দ্র দিচ্ছিত—বাঙ্গালার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ওবারসিয়র পরীক্ষা পাস করা। সংস্কৃত, বাঙ্গালা বেশ জানিতেন। সরল, প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ সাধুভাষায়, সুবোধিনী ছাপা হইত। ফুলস্ক্যাপ আকারের কাগজ; দুই স্তম্ভে। যাঁহারা সাধারণী দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন, সে সুবোধিনী আকারে প্রকারে সাধারণীর আদর্শ।" ('বঙ্গভাষার লেখক,' পৃ. ৫১৮-১৯)

<u>'সুবোধিনী' পত্রিকার ফাইল</u>।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১৮৫৮ সনের ১৭শ ও ১৮শ সংখ্যা।

রচনা-রত্নাবলি

'রচনা-রত্নাবলি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে ("মাঘ, বঙ্গাব্দ ১২৬৪") প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিজ্ঞাপন' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"বর্ত্তমানে বঙ্গভাষায় নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক, পত্রিকা ও সমাচার পত্রাদি প্রকাশিত হওয়াতে, এতদ্দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হইতেছে বটে, কিন্তু অপর সাধারণ লোকের উপকারার্থ বিনামূল্যে কোন মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয় না। অতএব, আমরা কয়েক বন্ধু একত্র হইয়া বিনা মূল্যে এই মাসিক পুস্তক প্রকাশ করিলাম। ইহাতে নানা বিষয়িণী গদ্য পদ্যময়ী রচনা প্রকাশিত হইবেক; …।"

প্রাণনাথ দত্ত প্রভৃতি এই মাসিক পত্রিকাখানির পরিচালক ছিলেন। ১৮৫৮ সনের ২৪এ মে তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এক জন পত্রপ্রেরক লেখেন,—

"…মহাশয়ের ৬০৫৫ সংখ্যক প্রভাকরে দেশহিতৈষি দয়াবান শ্রীমান বাবু

প্রাণনাথ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি কর্ত্তৃক 'রচনা রত্নাবলি' নাম্নি বিনামূল্যে নূতন মাসিক পত্র সাধারণজনগণের উপকারার্থ প্রকটিত আরম্ভ হওয়াদি বিষয় পাঠ পূর্ব্বক সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি,...।"

'রচনা-রত্নাবলি' পত্রের ফাইল।—

বহরমপুর রামদাস সেনের লাইব্রেরী :—

রতন লাইব্রেরী, বীরভূম :—১২৬৪-৬৭ সাল।

হিতৈষিণী পত্রিকা

'হিতৈষিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র কলিকাতা হাড়কাটা লেনস্থ হিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল। এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন কানাইলাল পাইন। ১৭৭৯ শকের ফাল্গুন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :—

"হিতৈষিণী সভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি প্রতিমাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক পত্র প্রয়োজন মতে ইংরাজী কিম্বা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তাহার প্রতি খণ্ডের মূল্য এক পয়সা মাত্র।..."

'হিতৈষিণী পত্রিকা' ১২৬৫ সালের বৈশাখ (১৮৫৮, এপ্রিল) মাস হইতেই প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৫৮, ১লা জুলাই (১৮ আষাঢ় ১২৬৫) তারিখের 'অরুণোদয়' নামক পাক্ষিক পত্রে প্রকাশ :—

"পাক্ষিক সংবাদ।—...কলিকাতার 'হিতৈষিণী' সভা ক্ষুদ্রাবয়বে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রথম সংখ্যা আমরা দেখিয়াছি।"

কলিকাতা পত্রিকা

১৮৫৮ সনের অক্টোবর মাসে 'কলিকাতা পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা মথুরানাথ দত্তের অধ্যক্ষতায় প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যায় আছে :—

"মাসিকী, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, সংবৎ ১৯১৫ কার্ত্তিক।"

এই পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৯ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

"কলিকাতা পত্রিকা।—আমরা কয়েক দিবস হইল, কলিকাতা পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পাঠ করত অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, কারণ এই পত্রিকার নব্য ভব্য লেখকেরা অতি সুপ্রণালীমতে রচনাদি করিতেছেন, তাঁহারদিগের লিপিনৈপুণ্যের বিষয় আমরা আর অধিক কি প্রকাশ করিব তাঁহারদিগের লেখাই পাঠকগণকে উপঢৌকন প্রদান করিলে ভাল হয়, এই পত্রিকায় প্রথমে লেখকদিগের 'বিজ্ঞাপনী' দ্বিতীয়ে 'উপক্রমণিকা' তৃতীয়ে 'বাঙ্গালার অবস্থা-সমাজ' চতুর্থে 'বিদ্যাশাস্ত্র' প্রকাশ পাইয়াছে পত্রিকার অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ দত্ত, অধ্যক্ষ বাবুর সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে পত্রিকার ক্রমোন্নতি হইবার বিলক্ষণ

সম্ভাবনা আছে, ভরসা করি গুণগ্রাহক মহোদয়েরা কলিকাতা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া লেখকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন, আমরা কলিকাতা পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিলে পর অতিশয় সন্তুষ্ট হইব। পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা কলিকাতা পত্রিকার দ্বিতীয় বিষয়টি গ্রহণ করিতেছি পাঠকগণ এতৎ পাঠেই লেখকদিগের লিপিনৈপুণ্যের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবেন।

উপক্রমণিকা

আমরা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে 'বাঙ্গলার অবস্থা' এই ক্রমিকপ্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম; এই ক্রমিক প্রবন্ধে, বাঙ্গলাদেশের বর্ত্তমান অবস্থা সমুদায় বর্ণিত হইবে। আমাদের এ ব্যবসায় দুর্ব্ব্যবসায় বলিতে হইবে। কবিকুলললামভূত প্রভাকরসম্পাদক প্রভৃতি প্রধান প্রধান লেখক ও দেশহিতৈষি মহাশয়েরা ইহার নিমিত্তে অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন; দেশের দুর্ভাগা বশত কেহই উত্তমরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই নিমিত্তই আমাদের ইহা দুর্ব্ব্যবসায় বলিয়া স্বীকার করিতেছি। তথাপি সদ্বিষয়ের যত পর্য্যালোচনা হয় ততই ভাল এই বিবেচনা করিয়া, আমরা এই ক্রমিকপ্রবন্ধ প্রকাশ করিতে উদ্যুক্ত হইলাম।

ভ্রম মানুষের সহজপদার্থ! কিন্তু ভ্রমের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া সহজ নহে। এনিমিত্তে আমরা সকলকে বিশেষতঃ সম্পাদক মহাশয়দিগকে বলিয়া রাখিতেছি, আমারদের অযুক্তিসিদ্ধি বা ভ্রমপ্রমাদ দেখিলে প্রকাশ করিবেন। আমরা অত্যন্ত সুখী হইব। যথার্থই আমাদের উদ্দেশ্য।"

'কলিকাতা পত্রিকা'র ফাইল।—

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম বর্ষের ১-৬ সংখ্যা।

পূর্ণিমা

পূর্ণিমা একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহা প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার মাসিক মূল্য ছিল তিন পয়সা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—"সন ১২৬৫ সাল। ৬ ফাল্গুন মাঘী পূর্ণিমা" অর্থাৎ ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিকথা-পাঠে জানা যায়, কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী 'পূর্ণিমা'র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলিয়াছেন,—

"বিচারক বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে সুহৃদ্বর কবি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম।… ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ' [৫ম সংখ্যায়] ও 'তাঁতিয়া টোপি।' কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমা'তে আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই। এ পত্রিকাখানিও অধিক দিন স্থায়ী হইল না।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০১)

'পূর্ণিমার' রচনার নিদর্শন হিসাবে ইহার প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

"পূর্ণিমা।—আহা! আমি এই নিশীথ সময়ে ভাগিরথীর, উদ্যান-শোভিত নির্জন তীরে দণ্ডায়মান হইয়া কি অপূর্ব্ব সুখই অনুভব করিতেছি। পূর্ণচন্দ্র ক্রমে ক্রমে আকাশের মধ্য সীমায় আগমন করিয়া জগৎকে যেন দুগ্ধফেনায় প্লাবিত করিয়াছেন। শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণ মেঘগুলিন্ তাঁহার সম্মুখে কেমন সুন্দর ভাবে খেলা করিতেছে। তারক পুঞ্জে নভোমণ্ডল সমাকীর্ণ হইয়া কেমন ফেনিল অম্বুরাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার ক্রোড়ে ক্রোড়ে তুলারাশির ন্যায় শ্বেত সূক্ষ্ম মেঘরাশী বায়ুহিল্লোলে তরঙ্গিত হইতেছে। স্থানে স্থানে এক একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র এক একটী মাণিকের ন্যায় দীপ্ দীপ্ করিতেছে। আকাশের নীলোজ্জ্বল বক্ষস্থলে ছায়াপথ যেন মুক্তামণ্ডিত হীরকহারের ন্যায় কেমন সুন্দর সুশোভন দেখাইতেছে। সুভ্র স্থূল মেঘ সকল আমার চতুর্দিকে কেমন নানা বিচিত্র ভাবে বিলাস করিতেছে। কোথাও যেন ধবলাগিরির শৃঙ্গপরম্পরা উড়িয়া যাইতেছে। কোথাও বা যেন শ্বেতবর্ণ বিতান সকল বিস্তৃত হইতেছে। আর কোথাও বা যেন বলাকা সকল পক্ষ কম্পন করিতেছে। আহা! সুধাকর আপনার অধস্থিত মেঘের অঙ্গে নিমেষে কেমন সুন্দর সুন্দর নূতন নূতন অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র চিত্র চিত্রিত করিতেছেন এবং এক একবার সেই চিত্রের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতেছেন, এক একবার মুখ বাহির করিয়া যেন আমার সহিত কত আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। আমিও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিব বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়াছি। ওগো দিগঙ্গনাগণ! তোমরা বুঝি আমার এই উন্মত্তচেষ্টা দেখিয়া এত হাস্য করিতেছ? আমার প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া হাস্য কর, অথবা তোমাদিগের হৃদয়রঞ্জণ সুধাকরের দর্শন লাভে প্রমোদিত হইয়াই হাস্য কর, বস্তুতঃ এ হাস্য অতি মধুর। আর আমি তোমাদের প্রফুল্ল বদন, মণিমুক্তাখচিত বিভূষণ, ও বিশ্ববিমোহন নৃত্য দর্শন করিয়াও আর্দ্রীভূত হইতেছি।…"

'পূর্ণিমা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—প্রথম বর্ষের ১ম, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। (কীটদষ্ট)

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—প্রথম বর্ষের ১-২, ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

হিতবিলাসিনী পত্রিকা

১৮৫৮ সনের শেষাশেষি সিমুলিয়া হরিঘোষের ষ্ট্রীটে 'হিতবিলাসিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।* এই সভা হইতে 'হিতবিলাসিনী পত্রিকা' বাহির হয়। খুব সম্ভব ইহা মাসিকপত্র ছিল। ১৮৫৯ সনের এপ্রিল (বৈশাখ ১২৬৬) মাসে 'হিতবিলাসিনী

* "আমরা গত ১৭ অগ্রহায়ণ বুধবাসরীয় পত্রে হিতবিলাসিনী সভার অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করত…" ('সংবাদ প্রভাকর', ১২ জানুয়ারি ১৮৫৯)

পত্রিকা' প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১১ই মে ১৮৫৯ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এক জন সংবাদ-দাতার পত্রে পত্রিকাখানির নাম পাওয়া যাইতেছে। এই পত্রে প্রকাশ,—

> "অপিচ 'হিতবিলাসিনী পত্রিকা' যাহার এক সংখ্যা সম্প্রতি মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত সমুদায়ই উক্ত অদ্ভুত চিকিৎসক তারকনাথ [দত্ত] লিখিয়াছেন, তাহার সহিত উক্ত সভার সভ্যগণ অথবা সম্পাদকের কোন সম্বন্ধ নাই...।"

মনোরঞ্জিকা

১২৬৬ সালে (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) ঢাকা হইতে 'মনোরঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইহাই ঢাকার সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাময়িক পত্র। ঢাকার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র—বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে মুদ্রাকর হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করিতেন। ১২৬৭ সালেই 'মনোরঞ্জিকা' উঠিয়া যায়।*

'মনোরঞ্জিকা' সম্বন্ধে ৺গিরিজাকান্ত ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

> "ঢাকা—নর্ম্মাল স্কুলের সংশ্রবে প্রতিষ্ঠিত 'মনোরঞ্জিকা-সভা'র মুখপত্র মনোরঞ্জিকা ঢাকার সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্র। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।... আমরা 'মনোরঞ্জিকা'র কোনও সংখ্যা প্রাপ্ত হই নাই। ব্যক্তিগত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও কবিতাকুসুমাবলীর বিজ্ঞাপনেই 'মনোরঞ্জিকা'র অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে।"†

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য'—কেদারনাথ মজুমদার, পৃ. ৩৪১।

† "চিত্তরঞ্জিকা"—শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ। 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন', ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৮, পৃ. ৭৫।

কয়েকটি নূতন সহজিয়া পদ*

একখানি সহজিয়া ধরণের পদসংগ্রহের পুথিতে কতকগুলি নূতন পদ পাইয়াছি। তাহার মধ্য হইতে নানা হিসাবে বিশেষত্বযুক্ত কতকগুলি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পুথিটিতে লিপিকাল লিখিত নাই। অক্ষর দৃষ্টে অনুমান হয় যে, পুথিটির বয়স ১৫০ বৎসরের কাছাকাছি।

নিম্নে যে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহার মধ্যে আটটি পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম আছে। শ্রীখণ্ড অঞ্চলে ষোড়শ শতকে এক কবি 'বিদ্যাপতি' আখ্যা পাইয়াছিলেন—ইহা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন। এই বাঙ্গালী বা 'ছোট' বিদ্যাপতির বাঙ্গালা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত আছে। শ্রীখণ্ড অঞ্চলে যে তান্ত্রিক বৈষ্ণবতার উদ্ভব হয়, তাহা আমি গত বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস" প্রবন্ধে এবং বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত "নরহরি সরকার ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়" প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং 'বিদ্যাপতি' ভণিতাযুক্ত সহজসাধনঘটিত পদগুলির রচয়িতা যে জনৈক বাঙ্গালী বিদ্যাপতি, ইহা আপাততঃ অনুমান করিতে বাধা নাই। কিন্তু পদগুলির রচনা যেরূপ নিম্নস্তরের এবং একভাবের, তাহাতে এবং ইহার ভাষায় যে আধুনিক রূপ দেখা যায়, তাহাতে এই পদগুলিকে ষোড়শ শতকের রচনা বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ এই পদগুলি অষ্টাদশ শতকে রচিত বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অষ্টম পদটিতে 'লছিমা'র উল্লেখ লক্ষণীয়। ইহাতে লছিমাকে গুরুর পদে উন্নীত করা হইয়াছে।

'বংশী' ভণিতায় যে দুইটি পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা বংশীবদনের রচনা বলিয়া মনে হয় না। বংশীবদনের সাধনার কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল, এই অছিলায় কোন সহজিয়া কবি 'বংশী' ভণিতা যোগ করিয়া স্বীয় একান্ত পঙ্গু কবিতাকে সুপ্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'বংশী' ভণিতায় ইহার পূর্ব্বে কোন সহজিয়া পদ পাওয়া যায় নাই, এই হিসাবে পদ দুইটি অপূর্ব্ব। দ্বিতীয় পদটিতে 'শ্রীরূপমঞ্জরী'র উল্লেখ আছে, ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, অন্ততঃ এই পদটি বংশীবদনের রচনা হইতে পারে না। 'বংশী' ভণিতার পদ দুইটিতে 'চণ্ডীদাস' ও 'লোচনের' কোন কোন পদের ধ্বনি আছে।

লোচনদাসের পদটি সহজিয়া সাধন সম্পর্কিত নহে। পদটি নূতন বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইল। জ্ঞানদাসের পদটিও নূতন মনে হইতেছে; ইহাও ঠিক 'সহজিয়া' পদ নহে। 'কৃষ্ণদাস' ভণিতাযুক্ত পদটি কবিরাজ গোস্বামীর রচনা না হওয়াই সম্ভব।

উদ্ধৃত পদগুলিতে তৎসম শব্দের রূপ শুদ্ধীকৃত হইল। গুরুতর স্থলে পাদটীকায় পুথির পাঠ প্রদর্শিত হইয়াছে।

---

* ১৩৪১।১৩ই মাঘ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বিদ্যাপতি

(১)

মানুষ মানুষ কহিলে কি হবে
না জানি মানুষরীতি।
মানুষ জে জন স্বতঃসিদ্ধ[1] হন
কে জানে তাহার রীতি ॥
মানুষের সঙ্গ জে জনা লইয়া
না করে মানুষাচার।
উঁচাত্যে উঠিয়া পড়িয়া মরএ
না হয় বিরজা পার ॥
গোলোক উপরে মানুষ বসতি
তাহার উপরে নাই।
মানুষ ভাবেতে জে জন ভজএ
সে জন মানুষ পাই ॥
সহজ ভাবেতে মানুষ ভজন
লোকে কহে কুবিচার।
বিদ্যাপতি কহে এমন হউক
আমি[2] নাহি চাহি আর[3] ॥

(২)

ভরত মুখেতে সুনি ভগবান
সহজ মানুষ কথা।
মানুষ আকৃতি মানুষ প্রকৃতি
ভরত মুখেতে গাঁথা ॥
সব পরিজন লয়্যা সঙ্কর্ষণ
সহজ মানুষ হল্যা।
সহজ রূপেতে সহজ মানুষ
আস্বাদন সভে কৈলা ॥
এমতি করিয়া মানুষ ভজহ
সহজ মানুষ ভাই।
বিদ্যাপতি কহে এমনি জানিহ
ইহার পরেতে নাই ॥

(৩)

মানুষ মানুষ ত্রিবিধ প্রকার
মানুষ বাছিয়া লই।
সৎসিদ্ধ[4] মানুষ অযোনি মানুষ
সংস্কার-মানুষ জেই ॥
সংগস্কার[5] জেই ব্রহ্মাণ্ডের সেই
সামান্য মানুষ নাম।
অযোনি মানুষ গোলোকের পতি
নিত্যস্থানে জার কাম ॥
তাহার প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পতি
লীলাকারী জার নাম।
সকল উপরে দিব্য বৃন্দাবন
সহজ মানুষ ধাম ॥
আনন্দ মোহন এই দুই জন
দুহেঁ দুহাঁ জানে রীত[6]।
বিদ্যাপতি কহে সে জন বুঝিবে
ইহাতে জাহার চিত ॥

(৪)

সহজ ভাবেতে সহজ ভজন
জে জন সহজ হয়।
সহজাস্বাদন করে জেই জন
সেই সে সহজময় ॥
সহজ এ দেহে কেবল জানএ
বিকার নাইখ মনে।
সহজ প্রমাণ ব্রজগোপীগণ
আস্বাদে সহজ সনে ॥
সহজ নাম বিরল ধাম
সহজ জাহার রীত।
সহজ করিয়া জে জন জানএ
বিকার না হয় চিত ॥

১। 'সতসির্দ্ধ'। ২। 'য়ামি'। ৩। 'য়ার'। ৪। স্বতঃসিদ্ধ। ৫। সংস্কার। ৬। 'রিত'।

সহজ আকৃতি সহজ প্রকৃতি
এই দেহে জেবা জানে।
সহজের সনে বিদ্যাপতি ভনে
এই সার মোর মনে॥

(৫)

মানুষ মানুষ সবাই বলএ
মানুষ নিগূঢ় কথা।
কেমন মানুষ কিবা প্রেমরস
মানুস বসতি কোথা॥
পিরিতি সায়রে তাহার মাঝারে
তাহার নিকটে সেই।
বসতি জানিয়া মানুষ বসতি
তবে সে পাইবে সেই॥
বেদবিধি পার বেভার আচার
বেদ বিষ্ণু নাই জানে।
সকল জগত করে আনন্দিত
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

(৬)

সহজ কথাটি সুন গো সই।
সহজ পিরিতি ভজন এই॥
নিজ দেহ দিয়া সেবিতে পারে।
সহজ পিরিতি কহিএ তারে॥
সহজ রসিক করএ প্রীত।
রাগের ভজন এমন রীত॥
সহজ মানুষ দেহেতে সেবে।
সে পুন রসিক জগত মাঝে॥
সহজ মরমে মজিল জারা।
পিরিতি ভজন বুঝিল তারা॥
সহজ নাগর নাগরী হল্যে।
সহজ পিরিতি না ছাড়ে মল্যে॥
সহজ মরমে জে হল্য রত।
তাহার মহিমা কহিব কত॥
বিদ্যাপতি কহে সহজ রীত।
বুজিয়া নাগরী করিবে প্রীত॥

(৭)

পদ্ম বিনা ভ্রমর চম্পকে মধু পিএ না।
বিশেষে রসিক জন রস বিনা জিএ না॥
বিশেষে রসিকের কথা বড়ই মধুর।
ছিণ্ডীলে না ছিণ্ড জায় মৃণালের সুত॥
বিবাদ বিচ্ছেদ ভাই নহে চিরদিন।
লাঞ্ছনে কাঞ্চন জেন না হয় মলিন॥
ইক্ষুক মধুর কত না জায় ছেদনে।
এমতি জানিবে ভাই সুজনের সনে॥
দুজনে সুজন হয় তবে জানি প্রেম।
পোড়ায়্যা ঝোড়ায়্যা জেন সোয়াগাতে হেম॥
বিদ্যাপতি বলে ভাই সাবধান হয়্য।
বচন বিষম বড় বুঝ্যে কথা কয়্য॥

(৮)

লছিমা আমার স্বরূপের গুরু।
তাহার চরণ কলপতরু॥
লছিমা আমার নঞান কোণে।
অনুরাগ রাখি সদাই মনে॥
শয়নে সপুনে সকলি সে।
তাহারে সঁপ্যেছি আপন দে॥
চরণে শরণ লয়েছি আমি।
জা কর তা কর লছিমা তুমি॥
ও দুটি চরণ সেবিব ভাবে।
হেন দিন মোর হইব কবে॥
কহে বিদ্যাপতি এই সে মন।
উপাসনা মোর লছিমা ধন॥

[পত্রাঙ্ক ৬ক-৭ক]।

বংশী

(১)

ভাবের উপরে ভাবের বসতি
তাহার উপরে ভাব।
আর মধু তাহে চাঁপার পাকুড়ি
গন্ধেতে ভেদিল লাভ ॥
জত জত জন রসিক কহায়
কেহ সে রসিক নয়।
তর তম করি নিশ্চয়ে বুঝিলাম
কোটিকে গোটিক হয় ॥
(কোন) কোন রসে কোন রসের উদয়
কোন সুখে কোন সুখ।
এ সুখ মাধুরী পসিয়া না পিএ
এ বড় দারুণ দুখ ॥
সভার উপরে কিবা সে ঝামরু
তাহার উপরে কে।
তাহার উপরে জে সুখ আছএ
রসিক পিয়এ সে ॥
শৃঙ্গার সে রসে ভাবের উল্লাসে
মরম কহিএ তারে।
রসিক জে জনা বুঝএ সে জনা
বংশী আস্বাদিতে পারে ॥

(২)

গোপীভাবোপরে পতিভাব আছে
তাহে গুরুজনা গাঁথা।
তাহার উপরে উপপতিভাব
কিএ অদভুত কথা ॥
আছিল কলিকা হল্য বিকশিত
তাহাতে হইল সুধা।
ফুলের সৌরভে ভ্রমরা গুঞ্জরে
রাশি রাশি পিএ মুদা ॥
জত গোপকন্যা রূপে অতি ধন্যা
পতিরস নাহি চায়।
পিরিতি করিয়া পতি করি মানে
রসিক না কহি তায় ॥
সভার উপরে শ্রীরূপমঞ্জরী
তাহার উপরে রাধা।
এ সুখ মাধুরি পসিয়ে জে পীএ
তার মন কহি সাধা ॥
শৃঙ্গার রসকে মিছার কহিএ
পরকিয়া কহি যেভা।
তাহার উপরে অতি সুমধুর
পিরিতি আখর নেহা ॥
আর অদভুত অধর চুম্বিত
ই কথা কহিব কারে।
দেখিলাম বিচারি সাধে ব্রজনারী
বংশী আস্বাদিতে পারে ॥

[পত্রাঙ্ক ৭খ-৮ক]

লোচন

শ্রীরূপমঞ্জরী সঙ্গে অনঙ্গমঞ্জরী।
শরদ পূর্ণিমার চাঁদ গমনমাধুরী ॥
কুমকুম জিনিয়া তার অঙ্গের মাধুরী।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি ফিরে গুঞ্জরি গুঞ্জরি ॥
মঞ্জরীর মাঝে মাঝে রাইএর গমন।
সুখদ কাননকুঞ্জে শ্যামের মিলন ॥
চামরে চম্পকলতা ঝাঁপিয়া রাখিল।
অলখি দুহাঁর অঙ্গ রসেতে ভরিল ॥
তরুণ তমাল শ্যাম রাই কাঁচা সোনা।
লোচনদাসের মনে উপজল প্রেমা ॥

[পত্রাঙ্ক ৫ক]